উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র – ৪০৫

নাট্যতত্ত্ব, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও নাটক

পর্যায় – ক

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

FOREWORD

The Self Learning Material (SLM) is written with the aim of providing simple and organized study content to all the learners. The SLMs are prepared on the framework of being mutually cohesive, internally consistent and structured as per the university's syllabi. It is a humble attempt to give glimpses of the various approaches and dimensions to the topic of study and to kindle the learner's interest to the subject

We have tried to put together information from various sources into this book that has been written in an engaging style with interesting and relevant examples. It introduces you to the insights of subject concepts and theories and presents them in a way that is easy to understand and comprehend.

We always believe in continuous improvement and would periodically update the content in the very interest of the learners. It may be added that despite enormous efforts and coordination, there is every possibility for some omission or inadequacy in few areas or topics, which would definitely be rectified in future.

We hope you enjoy learning from this book and the experience truly enrich your learning and help you to advance in your career and future endeavours.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় - ক

একক ১। নাট্যতত্ত্বের ভূমিকা, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য এবং ইংরেজী নাটক, নাটকের উপাদান এবং গঠনকৌশল, ত্রিবিধ ঐক্য, অঙ্কবিভাজন।

একক ২। নাটকের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা।

একক ৩। নাটক এবং মঞ্চব্যবস্থা, কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়ের সূচনা।

একক ৪। লেবেডেফ এবং তাঁর The Bengally Theatre।

একক ৫। সখের নাট্যশালায় নাটকাভিনয়।

একক ৬। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস।

একক ৭। 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' এবং ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান।

পর্যায় - খ

একক ৮। নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী' - একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা,বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয়।

একক ৯। 'সধবার একাদশী' - চরিত্রবিচার, গঠন কৌশল, নামকরণের সার্থকতা ।

একক ১০। 'সধবার একাদশী' - গোত্র নির্ণয়, উদ্দেশ্যমূলকতা, সংলাপ, এবং অশ্লীলতা।

একক ১১। টিনের তলোয়ার : নাট্যকার পরিচিতি, উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি।

একক ১২। 'টিনের তলোয়ার' : প্রেক্ষাপট, চরিত্রবিচার।

একক ১৩। 'চাক ভাঙা মধু' : নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র।

একক ১৪। 'চাক ভাঙা মধু' - রাজনীতি, সামগ্রিক পর্যালোচনা ও চরিত্রবিচার।

ঐচ্ছিক পত্র ৪০৫ – নাট্যতত্ত্ব, রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ও নাটক

একক ৮। নাট্যকার দীনবন্ধু ও 'সধবার একাদশী' - একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা,বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'সধবার একাদশী' নাটকের অভিনয় – ভূমিকা, পরিচয়, পর্যালোচনার আলোকে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে 'সধবার একাদশী'।

একক ৯। 'সধবার একাদশী' -চরিত্র বিচার, গঠনকৌশল, নামকরণের সার্থকতা - 'সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র বিচার, গঠনকৌশল, নামকরণের সার্থকতা।

একক ১০। 'সধবার একাদশী' - নাটকের গোত্র নির্নয়, উদ্দেশ্যমূলকতা, সংলাপ এবং অশ্লীলতা - গোত্র নির্নয়, উদ্দেশ্যমূলকতা, সংলাপ, অশ্লীলতা ।

একক ১১। টিনের তলোয়ার : নাট্যকার পরিচিতি, উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি – ভূমিকা, নাট্যকার পরিচিতি, উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি।

একক ১২। 'টিনের তলোয়ার' : প্রেক্ষাপট, চরিত্রবিচার – প্রস্তাবনা, ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তুর নিরিখে চরিত্র বিচার।

একক ১৩। 'চাক ভাঙা মধু' : নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র – প্রস্তাবনা, নাট্যকার হিসাবে মনোজ মিত্র, নাটকের বিষয়বস্তু।

একক ১৪। 'চাক ভাঙা মধু' – রাজনীতি, সামগ্রিক আলোচনা ও চরিত্রবিচার – নাটক 'চাক ভাঙা মধু' ও রাজনীতি, নাটক 'চাক ভাঙা মধু'র সামগ্রিক পর্যালোচনা ও চরিত্র বিচার।

একক ৮ – নাট্যকার দীনবন্ধু ও ‘সধবার একাদশী’ – একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ‘সধবার একাদশী’ নাটকের অভিনয়

বিন্যাস ক্রম

৮.১ ভূমিকা

৮.২ পরিচয়

৮.৩ পর্যালোচনার আলোকে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'

৮.৪ বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে 'সধবার একাদশী'

৮.৫ অনুশীলনী

৮.৬ গ্রন্থঋণ

৮.১ ভূমিকা

দীনবন্ধু মিত্র বাঙালীর রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার।মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমসময়ে তাঁর নাটকগুলি জনপ্রিয়তার সাথে সাথেই শিল্পের বিচারেও রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।শখের নাট্যশালার সীমাবদ্ধতার কারণেই মাইকেল নাট্যজগত থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নিয়েছিলেন।দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ'-এর আবির্ভাবও সম্ভ্রান্ত মহলে আলোচনার ঝড় তুলে দিয়েছিল।কিন্তু শাসকের বিরুদ্ধতা কোনভাবেই নাটকটির কণ্ঠরোধ করতে পারেনি।বাঙালীর প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রার শুরুই হয়েছে 'নীলদর্পণ'-এর অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে।উনবিংশ শতাব্দীর নব্য শিক্ষিত তরুণ-যুবাদের

কাছে দীনবন্ধুর নাটকগুলিই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আদৃত হয়েছে।বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার অপূর্ব সহাবস্থান তাঁর রচনাগুলিকে সজীব করে তুলেছে।জীবন সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল তাঁর মধ্যে যে নিরীক্ষণ স্পৃহার জন্ম দিয়েছিল তার সুদক্ষ ব্যবহারে তিনি একের পর এক মঞ্চসফল নাটক রচনা করেছেন।যে জীবনকে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কোথাও রুচির বিকৃতি ঘটাননি।পরবর্তীতে 'সধবার একাদশী' নাটকের বিস্তারিত আলোচনায় সে সম্পর্কে আলোকপাত অবশ্যম্ভাবী।আসলে প্রতিটি মানুষের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে কোথাও প্রীতির রসে অভিষিক্ত করে গিয়েছে।জীবনের অসঙ্গতি,অপূর্ণতাগুলি থেকে তিনি যেভাবে হাস্যরস আহরণ করেছেন তা তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসিকের অভিধায় ভূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট।অফুরন্ত জীবন-প্রীতিই তাঁর এই প্রতিভার উৎস।তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাস্তবতাবোধ এবং পক্ষপাতহীন উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধু মিত্রের সবথেকে বেশী আলোচিত নাটকগুলির মধ্যে একটি।উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নব্য শিক্ষিত তরুণদের রুচি এবং আচরণে যে অসঙ্গতি দেখা গিয়েছিল,তার সামগ্রিক পরিচয় এই প্রহসনটিতে ধরা পড়েছে।মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির সঙ্গে এর ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে।তবে এই নাটকে নাট্যরস আরো বেশী পরিমাণে সংহত হয়েছে।ঘটনা-সন্নিবেশ,চরিত্র চিত্রণ,সংলাপ সমস্ত ক্ষেত্রেই 'সধবার একাদশী' একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসনের সার্থকতা অর্জন করেছে।

৮.২ পরিচয়

দীনবন্ধু মিত্র পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ।গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নের পর তিনি পিতার প্রচেষ্টায় স্থানীয় জমিদারের সেরেস্তায় মাসিক আট টাকা বেতনের চাকরিতে যোগদান করেন।অথচ তাঁর মধ্যে ছিল উচ্চশিক্ষা লাভের তীব্র আকাঙ্খা।তাই পাঁচ বছর

চাকরি করার পর তিনি পিতার অমতে গোপনে কলকাতায় চলে যান।সেখানে পিতৃব্য নীলমণি মিত্রের আশ্রয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

কলকাতায় পড়াশুনার খরচ বহন করতে গিয়ে দীনবন্ধুকে গৃহভৃত্যের কাজ করতে হয়েছে।প্রথমে তিনি রেভারেন্ড জেমস লং-এর অবৈতনিক স্কুলে কিছুদিন পাঠগ্রহণ করেন।এই সময়েই তিনি নিজের পিতৃদত্ত নাম বদল করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন।এরপর কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ (১৮৫০) পরীক্ষায় পাস করে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।কলেজের সকল পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করেন।বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বরাবর সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করেন।

দীনবন্ধুর কর্মজীবনের আরম্ভ ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে যোগদানের মধ্যে দিয়ে।চাকুরী জীবনে তাঁকে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে।এর ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ক্রমাগত ঋদ্ধ হয়েছে।১৮৭১ সালে লুসাই যুদ্ধের সময় তাঁর ওপরে কাছাড়ে সফলভাবে ডাক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যা তিনি যথাযথভাবে পালন করেন।এজন্য সরকার তাঁকে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত করে।যদিও কোন কারণবশত ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল হগের অপ্রীতিভাজন হওয়ায় সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেলের পদ থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়।এরপর তিনি ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন(১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ)।

কলেজে পড়ার সময় ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে 'সংবাদ প্রভাকর', 'সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতাচর্চার মধ্যে দিয়ে দীনবন্ধুর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত।কবিতা রচনা করলেও মূলত নাটক ও প্রহসন লিখেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন।তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমংকরেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং’ নামে প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর নাটকটির প্রথম অভিনয় ন্যাশনাল থিয়েটারে সম্পন্ন হয়।নীলচাষকে কেন্দ্র করে নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়ন এবং শাসকশ্রেণীর

পক্ষপাতমূলক আচরণ নাটকটির বিষয়বস্তু।নাটকটি তৎকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।অনেক সমালোচকই এই নাটকের মধেযে প্রথম জাতীয় ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।এই নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।প্রকাশক ছিলেন দীনবন্ধুর বাল্য শিক্ষক পাদ্রী জেমস লঙ।নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে 'ইংলিশম্যান' পত্রুকার সম্পাদক গ্রন্থটির মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন।বিচারে পাদ্রী লঙ কারাবাস এবং মুদ্রাকর C.H Manuel অর্থদন্ডে দন্ডিত হন।সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'নীলদর্পণ'কে হ্যারিয়েট বিচার স্টো'র কালজয়ী সৃষ্টি 'আঙ্কল টমস কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেন।'

'নীলদর্পণ' ছাড়াও দীনবন্ধু সমকালীন হিন্দুসমাজের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে নিয়ে একাধিক প্রহসন রচনা করেছেন।তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ও প্রহসন হলো - 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬),' লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) প্রভৃতি।'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী' কালের বিচারে উচ্চাঙ্গের সামাজিক নাটকের মর্যাদা লাভ করেছে।তাঁর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'জামাই বারিক' প্রহসন দুটির অভিনয়ও সমসময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

দীনবন্ধুর দুটি কাব্যগ্রন্থ হল - 'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২) ও 'সুরধুনী কাব্য' (২ ভাগ ১৮৭১, ১৮৭৬)।'সুরধুনী কাব্য' হিমালয় থেকে গঙ্গাদেবীর সাগরসঙ্গমে যাত্রার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা।এতে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদ এবং বঙ্গদেশ ও সমকালীন কলকাতার বিশিষ্ট স্থান ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে।

দীনবন্ধু সমাজকল্যাণনিষ্ঠ শিল্পী হলেও সমাজ সংস্কারের স্পৃহা তাঁর কোন নাটকের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করেনি।জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর নাটকে কোথাও কৃত্রিমতার জন্ম দেয়নি।সত্যের অবিচল অনুসরণে তিনি তৎপর ছিলেন।সহানুভূতির দ্বারা তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন।তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকগুলি আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।এরপর মহাকবি

মধুসূদন বাঙালীর রঙ্গমঞ্চের সাথে অচিরাৎ যুক্ত হয়ে পড়লেও তাঁর নাট্যকার জীবনের যথাযথ বিকাশ সাধন সম্ভব হয়নি।তাঁর প্রহসনদুটি দীনবন্ধুর নাটক রচনার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।এই প্রভাবকে গ্রহণ করেই দীনবন্ধু সমাজ-জীবনের গভীরতর দেশে নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করেছিলেন।জীবনাভিজ্ঞতার অভাব তাঁর কখনোই ছিলনা।তাই তিনি নিরলসভাবে একের পর এক তোরাপ,রাইচরণ,পদী ময়রানী,আদুরী বা নিমে দত্তের মতো অবিস্মরণীয় চরিত্র নির্মাণ করতে পেরেছেন।সেদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি বাংলাদেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের প্রথম জীবন ভাষ্যকার।বাংলার ধুলোমাটির স্পর্শস্বাদ তাঁর নাটকেই প্রথম অনুভব করা গেল।এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশের ফলেই সেকালের শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী দীনবন্ধুর নাটকাভিনয়ে বিশেষ উৎসাহ লাভ করেছিল।তাই বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিকাশে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর এই মহৎ প্রতিভার অকাল প্রয়াণ ঘটে।

৮.৩ পর্যালোচনার আলোকে দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধু মিত্রের একটি যুগতিক্রম্য সৃষ্টি,যার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর মানসদ্বন্দ্বটি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকায় এই নাটকটিকে দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।এর কারণ হিসেবে তারা একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হিসেবে দীনবন্ধুর মধ্যে নিস্পৃহতা এবং নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের সার্থকতম সহাবস্থান প্রত্যক্ষ করেছেন।উপন্যাসের ক্ষেত্রে একজন ঔপন্যাসিক তাঁর ব্যক্তিগত অভিপ্রায়টিকে প্রকাশ করতে পারেন।কিন্তু নাট্যকারের গতিবিধি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত।তিনি তাঁর বক্তব্যকে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে খেয়ালখুশি মতো প্রকাশ করতে পারেন না।একবার নির্মিত হওয়ার পর চরিত্রগুলির কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়ে যায়।ফলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে

নাট্যকারকে বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখতে হয়,যাতে দর্শকের কাছে চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে।

নানান মতামত ও আলোচনায় 'সধবার একাদশী' একটি সার্থক প্রহসন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।দীনবন্ধুও সমকালীন জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে চিহ্নিত করে প্রহসনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক আধারেই তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।কিন্তু হাস্যরসের সমান্তরালে এই নাটকে ফুটে উঠেছে উনবিংশ শতাব্দীতে যৌবনের অপচয়ের এক বেদনাময় চিত্র,যে কারণে অনেকে একে বিয়োগান্তক কমেডি হিসেবেও নির্দেশিত করতে চান।একদিকে অধঃপতিত বাবু কালচারের অন্তঃসারশূন্যতা,অন্যদিকে শিক্ষিত বাঙালি যুবকের আত্মদ্বন্দ্ব - এই দুইয়ের যুগপৎ প্রবাহে 'সধবার একাদশী' শিল্পগুণের বিচারেও একটা উৎকৃষ্ট নাটকে পরিণত হয়েছে।সমাজ সমস্যার পরিচয় এই নাটকে থাকলেও নাটকটি কখনোই সমস্যামূলক নাটক বা Problem Drama নয়।এর পটভূমি তৎকালীন সময়ের শহর-জীবনকে কেন্দ্র করেই বিন্যস্ত হয়েছে।যেখানে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং সেই বিরোধের কোন সমাধানসূত্র তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।ফলে কালের বৈগুণ্যেই নিমচাঁদের মতো শিক্ষিত তরুণেরা মদ্যাসক্তি এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আত্মবিনাশের দিকে এগিয়ে গেছে।

আলোচ্য নাটকটিতে নাট্যকারের উদ্দেশ্যমুখীনতার পরিচয় ততটা দুর্লভ নয়।আসলে উদ্দেশ্যমুখীনতা নাটক বা থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।কিন্তু উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রেখে যেখানে নাট্যকার ব্যাপকতম জনমণ্ডলীর আনন্দবিধানে সক্ষম হন,সেখানে শিল্পী হিসেবে তার সার্থকতা।সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে 'সধবার একাদশী' নাটকে প্রচারমুখীনতা নাট্যকারের জাগ্রত শিল্পবোধের কাছে পরাস্ত হয়েছে।দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে 'সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক রচনায় নাটকটির উদ্দেশ্যমুখীনতার দিকটি স্বীকার করে নিয়েছেন -

"যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজামণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া,সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব 'নীলদর্পণ' রচনা করিয়াছিলেন,সেইরূপে দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত

ভদ্রমণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া 'সধবার একাদশী' রচনা করেন।শিক্ষিত সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বাহ্য চাকচিক্যে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছিল,আমার পিতৃদেব সেই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।দুইটি জলীয় পদার্থ বিশেষকে একত্রে মিশ্রিত করিলে যেমন ফেনপুঞ্জের আবির্ভাব হয়,শিক্ষিত সমাজের তখন সেই অবস্থা ছিল।কলেজের ছাত্রগণ অনেকেই তখন স্থির শান্ত,স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন হইয়াছিল.....মদিরা রাক্ষসীর প্রভাব শিক্ষিত যুবকদের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য করিতেছিল।মদ না খাওয়া যেন শিক্ষার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইত।শিক্ষিত সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ দেশানুরাগিগণ সেই সময়ে 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করিয়া মদিরার স্রোত রোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।"

- সমাজসচেতন নাট্যকার দীনবন্ধু সমাজের এই দুর্দশা মোচনের জন্যই সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে ললিতচন্দ্র মিত্র তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।সেকালের অধিকাংশ সমালোচকই 'সধবার একাদশী' নাটককে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেননি।মদ্যপানের ভয়াবহ ফলাফল চিত্রিত হওয়ায় এই নাটকটি যে মদ্যপান নিবারণী সমিতির প্রচারকার্য হিসেবে কিছুটা মূল্যবান,এইরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন।এমনকি দীনবন্ধুর বিশেষ অন্তরঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রও এই নাটকটিকে রুচির বিচারে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি এবং তিনি দীনবন্ধুকে সংশোধন ছাড়া এই নাটকের প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন।যদিও পরবর্তীতে নাটকটি প্রকাশিত হয়ে সমাজে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিলে বঙ্কিম এই নাটকটির সদর্থক দিককে অস্বীকার করতে পারেননি।তাই তাঁর সচেতন মন্তব্য -

"অনুরোধ রক্ষিত রক্ষা হয় নাই ভালোই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি।"

- আসলে 'সধবার একাদশী'কে শুধুমাত্র মদ্যপান বিরোধী প্রচার নাটক বা ইংরেজীয়ানার ভ্রান্ত অনুকরণে মাতলামি আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়না।এই নাটক প্রাচীন ও নবীন দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে সৃষ্ট যুগযন্ত্রণাকে ধারণ করেই অগ্রসর হয়েছে।মধুসূদনের দ্বিতীয় প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রেরণা থাকলেও 'সধবার একাদশী' সর্বাংশে এই জাতীয় প্রহসন নয়।এর মধ্যে বাঙালির নকল সাহেবিয়ানা এবং বাবু সংস্কৃতির প্রতি তীব্র শ্লেষের সঙ্গেই মিশে রয়েছে নিমচাঁদ চরিত্রের বেদনার্দ্র পরিণাম।ড.সুকুমার সেনের মতে -

"নিমচাঁদ ইংরেজিতে সুশিক্ষিত এবং ভদ্রসন্তান হইয়া মদ্যপের চরম অধোগতিপ্রাপ্ত।কিন্তু সে পতিত বটে, তবে স্বর্গভ্রষ্ট।আত্মসম্মান সে বিসর্জন দিয়াছে,মদের জন্য অপমান-গঞ্জনা সে অঙ্গভূষণ করিয়াছে,তবু শিক্ষার গৌরবে চারিদিকের তুচ্ছতার ও মূঢ়তার মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে,সেখানে খোঁচা মারিলেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।"

- এই নিমচাঁদ চরিত্রের পক্ষে যে কোনভাবেই কেরানী হয়ে ইংরেজের দাসত্ব করা সম্ভব ছিলো না তা পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী অনুভব করেছিলেন।অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাথে কথোপকথনে তাঁর মন্তব্য -

"নিমচাঁদের জীবনটা ছিল ফ্রাসট্রেসনে ভরা। এত বড় শিক্ষিত এক যুবক।ইংরেজ তাকে দিত কি? কেরানির চাকরি।এত বড় ইংরেজি নবিশ কিনা কেরানী হয়ে সাহেব সেবা করবে?তাই তাকে করতে হলে বিদ্রোহ।কিন্তু বিদ্রোহই বা তখনকার দিনে করে কি করে।তাই তাকে ধরতে হলো মদ।অমন একটা গুণী লোক উৎসন্ন গেল।সেও একরকম বিদ্রোহ।বিদ্রোহী নিমচাঁদকে দেশ একদিন চিনবে। সে মাতাল নয়,সে স্বাধীন।"

- প্রকৃতপক্ষেই নিমচাঁদ আলোচ্য নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।নাটকের যাবতীয় শ্রেষ্ঠতা এই চরিত্রের ওপরেই নির্ভরশীল।অনেকে অটলবিহারীকেই 'সধবার একাদশী' নাটকের নায়ক হিসেবে মনে করেন।প্রহসনে নীচতার কারণে যে ধরনের চরিত্রের

প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক হয় অটল সেই ধরনের চরিত্র।কিন্তু তার মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নেই।সে নির্দ্বন্দ্ব।শিক্ষা,সংস্কৃতি,রুচি,আচার-ব্যবহার সমস্ত ক্ষেত্রেই সে নিকৃষ্টতার পরিচয় বহন করে।তুলনায় নিমচাঁদ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বের প্রভায় অনেক বেশী উজ্জ্বলতর।সে মাতাল হতে পারে তবু শিক্ষা-সংস্কৃতির দীপ্তি তার চরিত্র থেকে পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি।তার মুখ দিয়ে নাট্যকার যে সকল সংলাপ বলিয়েছেন তা ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের একজন যোগ্য প্রতিনিধি রূপেই তাকে হাজির করেছে।বিত্তবান অটলবিহারীর অর্থে সে নিজের মদ্যাসক্তির চাহিদাকে পূর্ণ করেছে,অথচ সেই অটলের প্রতিই ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করতে সে দ্বিধা বোধ করেনি।যদিও সবটাই হয়েছে wit - এর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে।তার প্রতিটি শ্লেষের অর্থ অনুভব করার মতো ক্ষমতা অন্তঃসারশূন্য অটলের ছিলোনা।তাই আজকের আধুনিক পাঠকের কাছে এই নাটকের সংলাপ শিল্পসৌকর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে।কলকাতার বাবু সম্প্রদায়ের নগ্ন স্বরূপকে উদঘাটিত করার পাশাপাশি যুগসন্ধিকালের ব্যর্থ যৌবনের ট্র্যাজেডি আমাদের মনকে করুণায় অভিভূত করে দেয়।তাই আর পাঁচটি প্রহসনের মতো এই নাটকে কেবল জীবনের লঘুতার দিকগুলিই ফুটে ওঠেনি,বরং বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই এক গভীরতর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে।সেই সত্যের পটভূমিকায় নিমচাঁদ এবং অটলবিহারী যেন পরস্পরের পরিপূরক চরিত্র।এই দুই চরিত্র নিজেদের নানান সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের একত্রীকরণে জীবন সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টিকোণের জন্ম দেয়।জীবনের জটিল মিশ্র পরিচয়টিকে চিত্রিত করতে গিয়ে দীনবন্ধু নাটকে ইংরেজী উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন।এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে দিয়েই নিমচাঁদ চরিত্রের বিবর্তন সাধিত হয়েছে।কালের অসঙ্গতি আত্মসচেতন নিমচাঁদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে তা নবজাগরণের নানামুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি।নিমচাঁদ অটলের ইয়ার হলেও সে ব্যক্তিত্বহীন নয়,ভোলার মত নির্বোধ ইয়ারকি তাকে শোভা পায়না।ইংরেজী শিক্ষা তার মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীরতর বোধের জন্ম দিয়েছে।অথচ বহির্জীবনের নৈরাশ্যের দ্বারা সেই বোধ হয়েছে পীড়িত।ফলে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে তীব্র অনাসক্তি ও বিতৃষ্ণা।নকুলেশ্বর,গোকুলচন্দ্র প্রমুখের বিভিন্ন সৎপ্রচেষ্টা যে আদতে কতটা শূন্যগর্ভ

ও কপট তা সে জানে।রামমাণিক্য বা কেনারাম বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে তার চেয়ে কত ছোট,সে সম্পর্কে সে সচেতন।তাই তাদের প্রতি নিমচাঁদ করুণা মিশ্রিত কৌতুক অনুভব করে।সে মাতাল হতে পারে কিন্তু তার প্রতিটি আচরণে এক সূক্ষ্ম আভিজাত্যবোধ আমরা প্রত্যক্ষ করি।এই আভিজাত্যের কারণেই সে সকল প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থেকেছে।অটলবিহারী যেমনভাবে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে হরণ করতে উদ্যত হয়,তেমন জঘন্য কাজের প্রতি নিমচাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।সে পুণ্যাত্মা নয়,নীতিনিষ্ঠও নয়,কিন্তু স্রেফ ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দায়েও তাকে অভযুক্ত করা যায়না।সবদিক দিয়ে সে এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির থেকে উচ্চতর আসন অধিকার করেছে।মূলত সময়ের অসঙ্গতিই তার মতো জ্ঞানী ও প্রতিভার অধিকারী মানুষকেও অধঃপতিত জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে এবং সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়ার কারণেই তার সত্তাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে।একদিকে আশা ও মূল্যবোধ,অন্যদিকে গভীর নৈরাশ্য - এই দুইয়ের টানাপোড়েনে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে।তার মুখের প্রতিটি সংলাপ তাই গভীরতর ব্যঞ্জনা বহন করে।তার সমস্ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে একটি হৃদয়ভেদী অনুতাপ,যাকে কোনভাবেই ব্যক্ত করা যায়না।ফলে 'সধবার একাদশী' নাটকে কমেডির অন্তরালে ধ্বনিত হতে থাকে একটি করুণ সুর,একটি ট্র্যাজিক চরিত্রের অভ্যন্তরস্থ বেদনার ফল্গুধারা।

৮.৪ বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে ‘সধবার একাদশী’

১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের কুশীলবেরা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এর পূর্বে বাগবাজারের 'সখের যাত্রাদল' মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয় করে জনসমাদর কুড়িয়েছিলেন।গিরিশচন্দ্র এই যাত্রাপালার উপযোগী গান রচনা করে কিছুটা সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।অন্যদিকে শিক্ষিত বাঙালি সেসময় সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের মাধ্যমে বাংলা নাটককে বিত্তবানের অধীনতা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।কিন্তু নাটক মঞ্চায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের কোন বিকল্প উপায় তখনো আবিষ্কৃত

হয়নি।বাগবাজারের নাটক পাগল ছেলেদের প্রথম নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে মূলত এই অর্থের ভাবনাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল।এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলি তাঁদের কাছে সর্বাধিক আদৃত হয়েছিল।তাঁর নাটকের মঞ্চায়নে দৃশ্যপট বা পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অনেক কম।এই সমস্ত কারণেই বাগবাজারের যুবকবৃন্দ দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' নাটকটি অভিনয়ে মনস্থির করে।মনে রাখা প্রয়োজন কোন স্থায়ী মঞ্চ এঁদের ছিলোনা,ফলে অস্থায়ী ভাবে মঞ্চ নির্মাণ করে যাতে অভিনয় করা যায় সে ব্যাপারেও এই উৎসাহী যুবকদের ভাবতে হয়েছে।

দি বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথম অভিনয় আয়োজন করে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজারের মুখুজ্জে পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে।গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।পরবর্তী অভিনয় হয় এক সপ্তাহ পরে শ্সামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়িতে।এরপর গড়পাড়ে জগন্নাথ দত্তের গৃহে তৃতীয় এবং রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে চতুর্থ অভিনয় হয় স্টেজ বেঁধে,সাড়ম্বরে।চতুর্থ রজনীর এই অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েছিল।এই অভিনয়ে গিরিশ নিমচাঁদ,অর্ধেন্দুশেখর জীবনচন্দ্র এবং নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অটলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।নিমচাঁদের ভূমিকায় অবতীর্ণ গিরিশচন্দ্রের অসামান্য অভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে অমৃতলাল বসুর কলমে-

"মদে মত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে,

প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নটগুরু তার।"

- নাট্যকার দীনবন্ধু এই অভিনয় দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন।গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি গিরিশের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছিলেন -

"তুমি না থাকিলে এই নাটক অভিনয় হইত না।নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়া ছিল।"

- এই গিরিশচন্দ্রই লিখেছেন -

"জীবন চন্দ্রের অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ।স্বয়ং গ্রন্থকার অর্ধেন্দুকে বলেন আপনি অটলকে যে লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন উহা improvement on the author.আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।"

- গিরিশচন্দ্রই এই নাটকের শিক্ষক এবং নির্দেশক ছিলেন।প্রয়োজন অনুযায়ী নট-নটী নিয়ে একটি প্রস্তাবনা এবং কয়েকটি গান তিনি এই নাটকের জন্য রচনা করেছিলেন।নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয় তাঁকে খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।তাঁর মৃত্যুর পর 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল -

"About Forty Five years ago Girishchandra appeard in the inimitable role of Nimchand in Dinobandhu's 'Sadhaber Ekadasi' and when he awoke the next morning he found himself as an actor."

- আলোচ্য নাটকটি বাগবাজারের যুবকেরা মোট সাতবার অভিনয় করেছিলেন।পঞ্চম অভিনয়টি বাগবাজারে বসু পাড়ার সুবিখ্যাত সদরালা লোকনাথ বসুর গৃহে এবং ষষ্ঠ অভিনয়টি খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়িতে আয়োজিত হয়।সপ্তম এবং শেষ অভিনয় হয়েছিল চোরবাগানে স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়ি।ইনি পরবর্তীকালে বাংলা থিয়েটারের আরেকজন স্বনামধন্য পুরুষ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ ছিলেন।একই দিনে এখানে দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

'সধবার একাদশী'র সাফল্যই বাগবাজারের নাট্যদলটিকে ধারাবাহিকভাবে অভিনয় চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছিল।এক্ষেত্রেও তাঁরা দীনবন্ধু মিত্রের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।তাঁর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় এই দলকে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা এনে দেয়।অভিনয়ে দর্শক-সংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ে।দর্শক নিয়ন্ত্রণের জন্য টিকিট বিক্রির প্রস্তাব আসতে থাকে।এইসময় থেকে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।এই যুবকেরাই পরবর্তীতে সাধারণ রঙ্গালয়

বা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।২৮শে ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের চতুর্থ অভিনয়ে 'সধবার একাদশী' নাটকটি পরিবেশিত হয়।এরপরে অন্যান্য রঙ্গালয়েও এই নাটকটির অভিনয়ের ধারা অব্যাহত থাকে।দীনবন্ধুর নাটকগুলি সমসময়ের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দিয়েছিল।তার নাটকের অভিনয়ে সেই সময় সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র।তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর অবদানকে স্মরণ করে পরবর্তীকালে লিখেছিলেন -

"যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয় সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত;কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত,তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল।কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই।সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়।মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত,এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশানাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না।সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

- সুতরাং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেও দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৮.৫ অনুশীলনী

১. দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যজীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করে বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ চরিত্রের গুরুত্ব বিচার কর।

৩. 'অটলবিহারী এবং নিমচাঁদ একই মানবজীবনের দুটি বিপরীত দিক' - 'সধবার একাদশী' নাটক অবলম্বনে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৪. 'সধবার একাদশী' নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে নাটকটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত তা বুঝিয়ে দাও।

৮.৬ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড.অজিতকুমার ঘোষ

২. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস(১ম ও ২য় খণ্ড) - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র - ড.সুশীলকুমার দে

৫. দীনবন্ধু রচনাবলী - ড.ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

৬. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭. দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী : পর্যালোচনার আলোকে - সুজয় বসাক

৮. আশার ছলনে ভুলি - উৎপল দত্ত

৯. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক - গোলাম মুরশিদ

১০. ইন্টারনেট

একক ৯ – ‘সধবার একাদশী’ – চরিত্র বিচার, গঠনকৌশল, নামকরণের সার্থকতা

বিন্যাস ক্রম

৯.১ 'সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র বিচার

৯.২ 'সধবার একাদশী' নাটকের গঠন কৌশল

৯.৩ নামকরণের সার্থকতা

৯.৪ অনুশীলনী

৯.৫ গ্রন্থঋণ

৯.১ ‘সধবার একাদশী’ নাটকের চরিত্র বিচার

ক। নিমচাঁদঃ

'সধবার একাদশী' নাটকের চরিত্র আলোচনায় অগ্রসর হয়ে প্রথমেই নিমচাঁদের বিষয়ে কথা বলতে হয়।এই চরিত্রটি সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ক্লাসিক সৃষ্টির মধ্যে নিমচাঁদ অন্যতম।'সধবার একাদশী' নাটক বিচারের ক্ষেত্রেও নিমচাঁদ চরিত্রের যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এই দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রথম ধাপ।অথচ এই শিক্ষার সাথে জাতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্রটি কোনভাবেই রক্ষিত হয়নি।ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়।তখন একদিকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় সমস্ত সংস্কার এবং ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করছেন।অন্যদিকে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ সমাজে

আলোড়নের জন্ম দিয়েছে।সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে,নিমচাঁদের মতো চরিত্রেরা তারই অনিবার্যতাকে ধারণ করে পীড়িত হয়েছে।সে নব্য ভাবধারার একজন যথার্থ প্রতিনিধি।ইংরেজী সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের বিনিময়ে সমাজ তাকে কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি।ফলে তাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে।নিজের মদ্যপানের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করবার জন্য সে বড়লোকের ছেলে অটলের পানাসক্তিতে ইন্ধন জুগিয়েছে -

"সুরাপান নিবারনী সভা ত্বরায় নিপাত না হয় আমার ভারী অমঙ্গল - বড় মানুষের ছেলে ব্যাটারা এক একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে মরবো - এক ব্যাটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।"

- মাতাল হলেও নিমচাঁদ মার্জিত সাহিত্যরুচির অধিকারী।নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য সে প্রয়োজনে শেক্সপীয়রের বিভিন্ন নাটক থেকে মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর অংশবিশেষ স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করতে পারে।সে নিজের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং আত্মপ্রত্যয়ী।এই আত্মপ্রত্যয়ের কারণেই সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেনারাম বা অটলের প্রতি নিরুদ্বিগ্নভাবে ব্যঙ্গের তীর ছুঁড়ে দিতে পারে।সে পরাশ্রয়জীবী, অথচ তার চরিত্রে প্রবল আভিজাত্যবোধ পরিলক্ষিত হয়। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়' এই উক্তি সেই আভিজাত্যবোধেরই পরিচয় বহন করে।

নিমচাঁদ মদ্যপ হলেও বিকৃত রুচির দ্বারা পরিচালিত নয়।অটলের সাথে সে বারাঙ্গনা গৃহে যাতায়াত করলেও সে অটলের মতো লাম্পট্য দোষে দুষ্ট নয়।তার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে।অথচ তার দাম্পত্য জীবন সুখের নয়।স্ত্রীকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করে।দাম্পত্য জীবনে শূন্যতার কারণে তার পক্ষে স্বাভাবিক জীবনস্রোতে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি।পরাশ্রয়ে বসবাস তার মধ্যে যে আত্মগ্লানির জন্ম দিয়েছে তা তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে।তবে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিমচাঁদ শেষ পর্যন্ত সন্দিহান নয়।সে ভোলাচাঁদ বা রামমাণিক্যের থেকে উন্নত চরিত্র।তার চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক উপাদানের

সন্নিবেশ ঘটলেও ট্র্যাজেডির নায়ক সে নয়।অথচ তার হেরে যাওয়ার গ্লানি,আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত চরিত্র আমাদের মনে করুণার উদ্রেক করে।

নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্যে অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছায়া দেখতে পেয়েছেন।মাইকেলের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।তাই কোন নব্যবঙ্গের প্রতিনিধির চরিত্র অঙ্কন করতে গেলে যে তার প্রভাব পড়বেই তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।উৎপল দত্ত তাঁর 'আশার ছলনে ভুলি' গ্রন্থে মধুসূদন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা নিমচাঁদ চরিত্রের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য -

"ডিরোজিও নদীর মতোই মাইকেল ছিলেন নতুন য়ুরোপীয় ভাবধারায় দীক্ষিত।চার্লস ট্রিভলিয়ান তাঁর ভারতীয় জনগণের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধে এই সাহেব বাঙ্গালীদের সম্পর্কে এই আশা পোষণ করেছেন, এরা আর ভারতীয় থাকছে না।হয়ে উঠেছে পাক্কা ইংরেজ,সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের এরা হবে যোগসূত্র,সেতুবন্ধ।ট্রিভলিয়ান ভাবতে পারেন নি সেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও পথই মাড়াবেন না।"

- আত্মসচেতন নিমচাঁদের পক্ষেও শিক্ষান্তে ইংরেজের বাধ্য কেরানীগিরি সম্ভব ছিলনা।এমনকি ডেপুটি কেনারামকেও সে অবজ্ঞার চোখে দেখেছে।তার চরিত্রের সর্বপ্রকার ভণ্ডামী ও অন্তঃসারশূন্যতা নিমচাঁদ চরিত্রের মুখোমুখি খুব সহজেই উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।সেই কারণেই নিমচাঁদ তাকে 'Arrant coward' বলে ভর্ৎসনা করতে দ্বিধাবোধ করেনি।ঘটিরামের বিদ্যের দৌড় দেখে সে অবধারিতভাবেই মন্তব্য করেছে যে সে বিদ্যার জোরে নয়, বরং সুকতলার জোরেই ডেপুটি হয়েছে।

নিজের তুলনায় অন্যদের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে নিমচাঁদ নিঃসন্দিহান।কিন্তু প্রয়োজনে সে নিজেকে বিদ্রূপ করতেও পিছপা হয়না।সামাজিক স্বীকৃতির বদলে বিফলতা এবং দৈন্য তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।তার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি সুপরিস্ফুট তা একাধিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে তার মর্মগ্লানিকে প্রকাশিত করেছে -

"রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়!রে ধর্ম-লজ্জা-মানমর্যাদা পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! মাতাল রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাবো দেখি,তুমি কি ছিলে,কি হয়েছ।তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা,এখন হয়েছে একটি ভূত, যত দূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।"

- এই অনুশোচনার কোন বিরাম নেই।অথচ নিজের কুচরিত্র সম্পর্কে অবগত নিমচাঁদ কখনো কেনারামের মতো ভদ্রতা ও শালীনতার মুখোশ ধারণ করেনি।তাই সে আজ পিতা-মাতা-শ্বশুর-শাশুড়ি সকলের ঘৃণাস্পদ।সুস্থ জীবনের প্রতি তার আকর্ষণও রয়েছে।অথচ যুগসঙ্কটের কারণেই সে সুস্থ জীবনস্রোতে ফিরতে পারেনি।তার আত্মগ্লানিই বুঝিয়ে দেয় যে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ সচেতন।এই সচেতনতাই তাকে অটলের মতো সর্বপ্রকার পাপকাজে জড়িয়ে যাওয়ার থেকে বিরত রেখেছে।তাই উন্মত্ত অটল যখন তার নিজের খুড়শাশুড়িকে হরণের সংকল্প করেছে,তখন তাতে সে অসম্মতি জানায়।আসলে অনিয়ন্ত্রিত,সংযমহীন জীবনের দাসত্ব এবং স্বাভাবিক জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি - এই দুইয়ের সংঘাতে সে ক্লান্ত,বিধ্বস্ত।তার চরিত্রের এই করুণ দিকটি তার সকল ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করে আমাদের মনে সহানুভূতির জন্ম দেয়।তার ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করলে এই নাটকের বৃত্ত গঠনে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।তাই সমালোচকেরা যখন বলেন যে 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান আকর্ষণ নিমচাঁদ - তখন সেই অভিমতের প্রতি অসম্মতি জানাবার কোন কারণ থাকেনা।

খ। অটলবিহারীঃ

ধনীর সন্তান অটলবিহারী উনিশ শতকের বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি।অশেষ ভোগাকাঙ্ক্ষা তার রুচিকে বিকৃত করেছে।ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বাবু হওয়ার ভীষণ তাড়নায় সে তিনশো টাকা মাসোহারা দিয়ে বারাঙ্গনা কাঞ্চনকে রেখেছে।ইংরেজী সাহিত্য যেমন নিমচাঁদের মানসলোকে আভিজাত্যের উজ্জ্বল দীপ্তি সঞ্চারিত করেছিল,অটলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি।হেয়ার সাহেবের স্কুলে Baboo's

Class এ পাঠগ্রহণ করা অটলের বিদ্যের দৌড় অল্প।নিমচাঁদের অধিকাংশ বক্রোক্তির মর্মার্থ সে অনুমান পর্যন্ত করতে পারেনা।তার মুখে 'ওথেলো' নাটকের উদ্ধৃতি শুনে সে মন্তব্য করেছে তা নিশ্চিতভাবেই শেক্সপীয়রের 'Merchant of Venerials' থেকে গৃহীত।প্রত্যুত্তরে নিমচাঁদ তার স্বরূপ উদঘাটিত করে যথার্থই বলেছে -

"তুই ব্যাটা বিদ্যে খরচ করিস নে, তোর বাপ ব্যাটা বিষয় করেছে,বসে বসে খা - পাঁচ ইয়ারকে খাওয়া,মজা মার।"

- কেবলমাত্র অর্থবান পিতার পুত্র হওয়ার কারণেই অটল তার বন্ধুর থেকে উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করে।যদিও নিমচাঁদের চোখে সে আস্তাবলের বাঁদর হিসেবে বিদ্রূপের পাত্র।তার চরিত্রের অসঙ্গতি এবং হীনতা আমাদের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে।ভোগে প্রমত্ত হয়ে সে আপন খুড় শাশুড়িকে হরণের সঙ্কল্প করেছে।রুচিবোধের কোন বালাই তার মধ্যে নেই।আবার রামধন রায়ের হাতে প্রহৃত হয়ে সে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে হরণের মতলবকে নিমচাঁদের দোষ বলে চালিয়ে দিয়েছে।এর থেকে তার চরিত্রের কাপুরুষতার দিকটিও উন্মোচিত।সে নিজে লম্পট,অথচ নিজের চরিত্রের ত্রুটিগুলিকে আড়াল করতে গিয়ে সে নিমচাঁদের ওপর লাম্পট্য দোষ অর্পণ করে।আসলে সে নব্য সভ্যতার অপচয়ের একটি মূর্তিমান উদাহরণ।প্রাচীন এবং নবীন সংস্কৃতির সংঘাতের নিরসনে কোন নতুন জীবনবোধ তখনো গড়ে ওঠেনি।অটল উন্মার্গগামী এবং নীতিহীন।ইংরেজী শিক্ষা যে তার মধ্যে এই নীতিহীনতার জন্ম দেয়নি সে সম্পর্কে তার স্ত্রী পর্যন্ত অবগত।নিজের রুচিবিকার সম্পর্কে অটলের মনে কোন আক্ষেপও নেই।আসলে সে এমন এক সমাজের প্রতিনিধি যেখানে রুচি-শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোচনা গৌণ।তার পিতা অনেকের সর্বনাশ করে অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়েছেন।তাই অটলকে মদের প্রতি আসক্ত করে তারই অর্থে নিজের মদ্যপানের ব্যবস্থা পাকা করতে নিমচাঁদ দ্বিধা অনুভব করেনি,বরং এর ফলে অটলের বিত্ত যে সৎকর্মেই ব্যয়িত হবে,তা সে নকুলেশ্বরকে বুঝিয়েছে।চরিত্রাঙ্কনের নিখুঁত বাস্তবতায় অটল চরিত্রটি আমাদের কাছে ঘৃণা এবং বিরক্তির পাত্র হিসেবে বিবেচিত

হয়।নাটকের পরিণামে তার চরিত্রের কোন বড় পরিবর্তন দৃষ্ট হয়নি,ফলে অটলের দ্বন্দ্বহীন,নির্লিপ্ত চরিত্রটি কেবল পাঠকের নিন্দাই অর্জন করেছে।

গ। কাঞ্চনঃ

কাঞ্চন চরিত্রের মধ্যে দীনবন্ধু একজন সাধারণ পণ্যা নারীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে আরোপ করেছেন।সে অভিজাত।কারো প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের বন্ধনে বাঁধা পড়া তার স্বভাব ধর্ম নয়।অন্যান্য গণিকাদের মতোই তার একাধিক প্রণয়ীর অস্তিত্ব জানা যায়।সে প্রিয়শঙ্কর,রমানাথের মতো শহরের সম্ভ্রান্ত বাবুদের সেবাদাসী হয়ে থেকেছে।প্রভূত অর্থের অধিকারী অটল তার প্রতি বিশেষ অনুরক্তি প্রকাশ করলেও সে তার শ্রেণীস্বভাব ত্যাগ করতে পারেনি।কেনারামের সঙ্গে কথোপকথনে বা অটলের বাড়িতে উপস্থিতিকালে তার সংলাপে অভিজাত গণিকার গর্বোদ্ধত ভাব ফুটে উঠেছে।

নাটকে মোট চারটি দৃশ্যে নাট্যকার কাঞ্চনকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়েছেন।এই চরিত্রটির নির্মাণে নাট্যকার অসাধারণ বাস্তবতাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।কাঞ্চন নামকরণের মধ্যেও ব্যঞ্জনা লুকিয়ে রয়েছে।সে পণ্যা নারী মাত্র যাকে কাঞ্চনমূল্যেই ক্রয় করা যায়।নিজের বৃত্তি সম্পর্কে সে অতিমাত্রায় সচেতন।শ্রেণীস্বভাবের পাশাপাশি তার মধ্যে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যগুলিকেও নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।নিমচাঁদ মদ্যাসক্ত হলেও সে যে অটল বা কেনারামের থেকে স্বতন্ত্র তা কাঞ্চন উপলব্ধি করতে পেরেছে।এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সে নির্বোধ নয়।তার বাগবৈদগ্ধ,আচরণের নাটকীয়তা,ছলাকলা তাকে যথার্থ বারবিলাসিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।সব শেষে আমরা তার সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটিকে স্মরণ করে আলোচনার সমাপ্তি করবো -

"সে নিষ্ঠুর বলিয়া নির্মম নয়, নির্মম বলিয়াই সে নিষ্ঠুর; কামিনী কাঞ্চনের এ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত আর আছে কি!কাহারো প্রতি তার আকর্ষণ নাই, কিছুতেই তাহার মোহ নাই;কাম সাধনায় সিদ্ধির ফলে কামকেও সে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে - তাহার কামকলায়

একেবারেই 'কামগন্ধ নাহি',কামসাধনায় এক্ষণে সে সম্পূর্ণ নিষ্কাম, তাই সে অটলের জীবনে যেমন সহজে আসিয়াছিল তাহার জন্য তাহার জীবন হইতে তেমনি অনায়াসে বিনা নোটিশে চলিয়া গিয়াছে - এমনি কত জনের জীবন হইতে আগমন-নির্গমন অভ্যাসের ফলে তবে সে আশ্চর্য সিদ্ধিতে উপনীত হইয়াছে।" (বাংলা সাহিত্যের নরনারী)

ঘ। অন্যান্য চরিত্রঃ

আলোচ্য নাটকটিতে **নকুলেশ্বর** হাইকোর্টের উকিল।মদ্যাসক্ত হলেও সে সুরাপান নিবারণী সভার সপক্ষে যুক্তিবিস্তার করে।যদিও এটি তার চরিত্রের আসল পরিচয় নয়।রামমাণিক্য এবং ভোলাচাঁদের মতো সে মূর্খ নয়।তার সংলাপগুলির মধ্যেই বুদ্ধির দ্যুতি এবং যথাযথ ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়।নিমচাঁদের চরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্পর্কে সে অবহিত।নাটকের প্রথমাংশে সেও অটলকে মদ্যপানে উৎসাহিত করেছে।

ধনী মুক্তেশ্বর বাবুর জামাই **ভোলাচাঁদ** অল্প বয়স থেকেই মদ্যপ।মদ খাওয়ার সপক্ষে তার যুক্তি হল গুলিতে শরীর খারাপ হয়,ফলে তাকে মদ ধরতে হয়েছে।অটলের বৈঠকখানায় এসে সে তাকে ফাদার-ইন-ল রূপে সম্বোধন করেছে।গরমকালে তার পোশাক-পরিচ্ছদ ধনীর গৃহে প্রতিপালিত বাবু সম্প্রদায়ের উদ্ভট রুচির পরিচায়ক।তার চরিত্রের আরেকটি বিশেষ দিক হল সে মাতৃভাষার বদলে বিকৃত ইংরেজীর ব্যবহারেই বিশেষ উৎসাহী।তার উৎকট চরিত্র আমাদের কাছে হাস্যকর বোধ হয়।অটল এবং নিমচাঁদের সম্মুখে মদ্যপান না করে বহিরঙ্গে সে যে বিনয় প্রদর্শন করেছে সেটিও অত্যন্ত কৌতুকাবহ।

বাঙাল **রামমাণিক্য** চরিত্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গবাসীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও ভাষার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।দীনবন্ধু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হলেও এই চরিত্রটি সৃজনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।রামমাণিক্য অটল এবং নিমচাঁদের মাতাল যাত্রার এক সঙ্গী।তার নিবাস বিক্রমপুর অথচ সে ক্কলকাত্বাইয়া হওয়ার জন্য সচেষ্ট। এই উপলক্ষে

সে পতিতাপল্লী গমন,ব্র্যান্ডি পান থেকে শুরু করে গোরার বাড়ির বিস্কুট ভক্ষণ করেছে তবু সে কিছুতেই ক্কলকাত্বার উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।এ নিয়ে তার আক্ষেপের অন্ত নেই।নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে সপ্রশংসভাবে সেজে উচ্চারণ করেছে তাতে তার স্ত্রীর সম্ভ্রম বিনষ্ট হয়েছে। অথচ এই বিষয় উপলব্ধি করার মত বুদ্ধিটুকুও তার নেই।নিমচাঁদের মুখে নাট্যকার রামমাণিক্যের পরিচয় বর্ণনা করেছেন। তার অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে একাধিক চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে।তার অনেক সংলাপই যুগকে অতিক্রম করে অবিস্মরণীয়তা অর্জন করেছে।এই চরিত্রটি নির্মাণে পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি নাট্যকার কোন অসদ্ভাব প্রদর্শন করেননি। কাউকে আঘাত করা নয়,তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র অবারিত হাস্যরস সৃষ্টি।

কেনারাম ডেপুটি চরিত্রটি নির্বোধ এবং আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। সে সকলের কাছেই উপহাসের পাত্র।বিশেষত নিমচাঁদ তার চরিত্রের কোন দিকটি সকলের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে।ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিজের প্রতিপত্তি ও গৌরব প্রদর্শন করতে ইচ্ছুক হলেও ন্যূনতম ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি তাকে নিমচাঁদের সম্মুখে বিব্রত করে তুলেছে। নির্বুদ্ধিতার কারণেই লোকে তার নামকে বিকৃত করে 'ঘটিরাম' উচ্চারণ করে।নিমচাঁদও তাকে প্রকাশ্যে কেবলা হাকিম বলে সম্বোধন করেছে। সে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক হলেও হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে অস্বীকার করতে সে ভয় পায়। এই ভীতিই তার চরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করেছে।সে নিজেকে সংস্কারাচ্ছন্ন নয় বলে দাবি করে, অথচ প্রচলিত সংস্কারকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অটল এবং নিমচাঁদের মদ্যপানের অনুরোধে সে আঙ্গুল দিয়ে মদ স্পর্শ করে গালে নিয়েছে এবং বাড়ি গিয়ে আঙ্গুল ধুয়ে ফেলবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।তার চরিত্রের আসল পরিচয়কে সে সকলের সামনে গোপন করতে চেয়েছে।এক্ষেত্রে সে পদমর্যাদার দোহাই দিয়েছে।কিন্তু নিমচাঁদের সামনে তার সব জারিজুরিই ধরা পড়ে গিয়েছে।

সে নিজেকে ইংরেজিতে বিদ্বান বলে ব্যক্ত করলেও একটি বাক্যের ইংরেজী তর্জমা করতে গিয়ে সে অভিধানের খোঁজ করে। নকুলবাবুর কথার উত্তরে সে জানিয়েছে

বারাঙ্গনা পল্লীতে তার যাতায়াত নেই,কেননা তাতে পাপ হয়। কিন্তু কাঞ্চনের উপস্থিতিতে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

কেনারামের চরিত্রটি আদ্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ। সেই সময়ের মুন্সেফ এবং ডেপুটিদের সম্পর্কে অনেক হাস্যকর ঘটনা দীনবন্ধু জানতেন,একথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন।আমাদের অনুমান করতে অসুবিধা হয় না ঘটিরামের হাস্যাস্পদ চরিত্রটি সেই সব গল্পেরই কোন একটির থেকে গৃহীত হয়েছে।

৯.২ 'সধবার একাদশী' নাটকের গঠনকৌশল

সধবার একাদশী' নাটকটির কাহিনী জটিল নয়।নাটকের ঘটনাগুলি মূলত কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।ড.অজিতকুমার ঘোষ এই প্রহসনে নাটকীয় গতির অভাব লক্ষ্য করেছেন।তবে তাঁর মতে দৃশ্যসংযোজনের কোন অস্বাভাবিকত্ব এই নাটকে ধরা পড়েনি -

"ঘটনার বিক্ষিপ্ততা নাই বলিয়া বইখানার নাটকীয় রস জমাট হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।"

- মনে রাখতে হবে সমগ্র নাটকটির মধ্যে পরিকল্পনার অভাব থাকলে এই নাটকীয় রস ঘনীভূত করা সম্ভব হতো না।আদি-মধ্য-অন্ত্য জুড়ে একটি অখণ্ডতা বা সমগ্রতার বোধ এই নাটকটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।নানা প্রসঙ্গ ও উপপ্রসঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ফলেই এই অখণ্ডতা গড়ে উঠেছে।ড.নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে -

"এখানে স্পষ্ট ও পরিপাটি কাহিনীর পারম্পর্যমূলক শৃঙ্খলাধারার প্রত্যক্ষতা নেই;কাজেই যাকে বলে Syntagmatic Structural analysis,তা এখানে প্রযোজ্য নয়।বরং যাকে বলে Paradigmatic Structural analysis তাই এখানে প্রযোজ্য।"

- নাটকের নানা ঘটনা থেকে দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে সমালোচক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।নাটকের স্থান-কাল-ঘটনার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির প্রয়াসকে তিনি

স্বীকৃতি দিয়েছেন।ড.অজিতকুমার ঘোষ আলোচ্য নাটকটির সংলাপের চমৎকারিত্বের কথা বলেছেন।তাঁর মতে এই নাটকের সংলাপ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়।এক্ষেত্রে নাট্যকারের ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।ড.নির্মলেন্দু ভৌমিক নাট্যব্যঞ্জনার সঙ্গে গঠনরীতির এক অচ্ছেদ্য যোগ লক্ষ্য করেছেন।আসলে নাটকটি রচনার সময় নাট্যকার পরিকল্পনার সূক্ষ্মতা এবং সমগ্রতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

সম্পূর্ণ নাটকটিতে আমরা বিরোধের অনেকগুলি রূপ প্রত্যক্ষ করি।নিমচাঁদের আত্মদ্বন্দ্ব ছাড়াও বিরোধগুলি নাট্যঘটনায় গতির সঞ্চার করেছে।নিমচাঁদের চরিত্রে দুটি বিপরীত দিকের সমাবেশ ঘটিয়ে নাট্যকার তার দ্বৈত সত্তাকে আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।তার চরিত্রটি অটলের পরিপূরক।যুগ্ম চরিত্র হিসেবেই তারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।অটলকে মদ ধরানোর জন্য নিমচাঁদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।আবার নিমচাঁদকে গোকুলের বাড়িতে নেবার জন্য কেনারাম অটলের ষড়যন্ত্রটির কথাও উল্লেখ করতে হয়।সব শেষে গোকুলের স্ত্রীকে হরণের জন্য অটলের ষড়যন্ত্র ফুটিয়ে তোলার দ্বারা নাট্যকার গোকুলকে মাঝখানে রেখে নিমচাঁদ ও অটলের মধ্যে সংযোগসূত্রটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।তিনটি ক্ষেত্রের কোনটিতেই নাটকটির সমগ্রতা লঙ্ঘিত হয়নি,এখানেই নাট্যকার দীনবন্ধুর পরিকল্পনার সার্থকতা।

৯.৩ ‘সধবার একাদশী’ নাটকের নামকরণের সার্থকতা

সাহিত্যে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মধ্যে সর্বদাই একটি ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে যা সাহিত্যের মূল সুর বা বক্তব্যটিকে চিনে নিতে সাহায্য করে।নাটকেও যথাযথ নামকরণের মাধ্যমে একজন শিল্পী পাঠক বা দর্শকের মনে কাঙ্খিত অনুভূতি সৃষ্টিতে সক্ষম হন।শেক্সপীয়রের বেশিরভাগ ট্র্যাজেডিগুলির নামকরণ কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে করা হয়েছে।কমেডির ক্ষেত্রে তিনি তার মূল সুরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নামকরণে উৎসাহী। দীনবন্ধু যে সময়ের নাট্যকার সেই সময়ে তাঁর সামনে আদর্শ বলতে রামনারায়ণ তর্করত্ন বা মাইকেল মধুসূদন দত্তই

উল্লেখযোগ্য।রামনারায়ণের সমাজ সংস্কারমূলক নাটকগুলির নামকরণ বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে।দীনবন্ধু তাঁর প্রহসনে মাইকেলের আদর্শকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবুও বলতে হয় বিষয়ের দিক থেকে তাঁর এবং মধুসূদনের নাটকের অভিন্নতা থাকলেও, উপস্থাপনার নিরিখে তিনি আপন স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছেন।'একেই কী বলে সভ্যতা' নাটকে মধুসূদন ভ্রান্ত ইংরেজীয়ানার অনুকরণে তৎপর নব্যবঙ্গের উন্মার্গগামিতা এবং কপটতাকে তীব্র বিদ্রূপের দ্বারা বিদ্ধ করেছেন।পাশ্চাত্য শিক্ষার দোহাই দিয়ে নবকুমার বা কালীনাথের মতো যুবকেরা নিজেদের অধঃপতিত জীবনযাত্রাকে বজায় রাখতে চেয়েছে।'সধবার একাদশী' নাটকেও ইংরেজী অনুরক্ত বাবু সম্প্রদায়ের মদ্যাসক্তি এবং বারাঙ্গনা-বিলাসের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।কিন্তু এরই সাথে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি নিমচাঁদও সেখানে উপস্থিত,কালের সঙ্কটের আবর্তে যার চরিত্র অধঃপাতে যেতে বাধ্য হয়েছে,অথচ প্রকৃত শিক্ষার দ্যুতি যার চরিত্র থেকে একেবারে মুছে যায়নি।বোঝা যায় 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চেয়েছেন দীনবন্ধু নিজের নাটকে তার উত্তর অনুসন্ধানের সাথে সাথেই ট্র্যাজেডির উপাদানগুলিকেও এক সূত্রে গ্রন্থিত করতে চেয়েছেন।সেকারণেই আলোচ্য প্রহসনটি হাসি-কান্নার যুগ্ম প্রবাহে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে।

'সধবার একাদশী' নামকরণের মধ্যে নাট্যকারের গূঢ়ৈষণা নিহিত রয়েছে।এই জাতীয় নাম প্রথমেই আমাদের মনে বিস্ময় এবং চমকের জন্ম দেয়।একাদশী পালন মূলত নারীর বৈধব্যের সংস্কারের সঙ্গে জড়িত।সেখানে এই নামকরণটির মধ্যে একটি আপাত বৈপরীত্য ধরা পড়েছে।এই বৈপরীত্যের মধ্যেই নামকরণের ইঙ্গিতটি লুকিয়ে রয়েছে।সধবা হয়েও একজন নারী তার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে তার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতা হতে পারে।স্বামীর উপেক্ষা ও অনাদর তার সধবাবস্থাকেও বৈধব্যের যন্ত্রণায় ধূসর করে দিতে পারে।এই যন্ত্রণা সহ্য করা কোন নারীর পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।অথচ 'সধবার একাদশী' নাটকে আমরা একাধিক ক্ষেত্রে এই ঘটনাই প্রত্যক্ষ করি।এখানে আভাসে কিংবা প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতের দ্বারা একাধিক নারী চরিত্রের

মর্মযন্ত্রণার পরিচয় নাট্যকার সকলের সামনে হাজির করেছেন।এই নাটকের চারটি ভিন্ন রীতিতে রচিত চরিত্রের সমাহারের বিপরীতে অনুক্ত থেকে গিয়েছে তাদের উপেক্ষিতা স্ত্রীদের কাহিনী।নবজাগরণের চিন্তা-চেতনা আমাদের মনে নারীর অবস্থানকে উচ্চে স্থাপিত করলেও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও নারী সমাজে তার কাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতিটুকু পায়নি।

নাটকের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো অটলবিহারী,নিমচাঁদ,রামমাণিক্য ও ভোলাচাঁদ চরিত্রগুলি উপস্থাপন কৌশল বিভিন্ন হলেও একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করা যায়,এদের প্রত্যেকের দাম্পত্য জীবনে অসঙ্গতি রয়েছে।রামমাণিক্য বা ভোলাচাঁদের স্ত্রীর উল্লেখমাত্র নাটকে রয়েছে।নিমচাঁদের ক্ষেত্রেও তাই সত্য।শুধুমাত্র অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর দুর্দশাই নাটকে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে।স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা কুমুদিনীর বেদনাহত পরিণতি আমাদের মনে তার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে।আবার কুমুদিনী তো কেবল একাই নন,সেই সময়ে ধনী বাঙালী ঘরের বধূরা সকলেই কমবেশী এই বঞ্চনার শিকার।এই নাটকেও ধনীর পুত্রবধূ কুমুদিনীর সাথে একই পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে নাটকে প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত রামমাণিক্য,ভোলাচাঁদ এবং নিমচাঁদের স্ত্রী।অশিক্ষিত রামমাণিক্য লোকসমক্ষে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষায় অক্ষম,তার মূঢ়তা আমাদের মধ্যে ভীষণ হাস্যোদ্দীপনার সৃষ্টি করে।কিন্তু 'ক্কলকাত্বাইয়া' হওয়ার বাসনায় তার বিসদৃশ আচরণ থেকে আমরা তার স্ত্রীর বিড়ম্বনার দিকটি অনুমান করতে পারি।

ভোলাচাঁদও ধনী মুক্তেশ্বর বাবুর জামাতা।তার আচরণও হাস্যরস সৃষ্টিকারী।অল্প বয়সেই সে কুসংসর্গে অধঃপতিত জীবনযাত্রার শরিক।মুক্তেশ্বর সুদর্শন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেও অচিরেই সেই কন্যার দাম্পত্য যে অসহনীয় বেদনার জন্ম দিয়েছে,নিমচাঁদের মন্তব্যেই তার পরিচয় মেলে -

"মুক্তেশ্বরবাবু অমন বিজ্ঞলোক হয়ে এই কূর্ম অবতারের হস্তে কন্যাটি প্রদান করেছেন?"

- নিমচাঁদের দাম্পত্যকাহিনী এর থেকে কিছুটা আলাদা হলেও তার স্ত্রীর দুর্ভাগ্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।তার স্বামী রামমাণিক্য বা ভোলাচাঁদের মতো মূর্খ নয়।বরং সুশিক্ষিত,বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যে তার ভালো দখল রয়েছে।তার সম্পর্কে অটল বিকৃত রুচি এবং চারিত্র্যদোষের অভিযোগ করেছে।কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমরা নাটক জুড়ে পায়না।সে অনাসক্তি নিয়েই বারাঙ্গনা গৃহে গিয়েছে।এমনকি অটল যখন নিজের খুড়শাশুড়িকে হরণের সঙ্কল্প করেছে তখন সে তাকে সতর্ক করে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছে।কিন্তু এসবের পরেও সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং অর্থের জোর না থাকার দরুণ তার শিক্ষা-দীক্ষা সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।মদ্যপান কিংবা আশ্রয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে।এই ঘটনা তার জীবনে অপরিমিত গ্লানির জন্ম দিয়েছে তা তার সংলাপেই প্রকাশিত -

"আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি,আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই।"

- ফলে একদা সকলের স্নেহ লাভ করলেও আজ সকলেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।তার দাম্পত্যজীবনকেও আমরা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখি।মদ্যপায়ী নিমচাঁদের স্ত্রীর অব্যক্ত গ্লানির স্বরূপটিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাটকে একমাত্র অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর যন্ত্রণাময় দাম্পত্যের প্রসঙ্গই সরাসরি আলোচিত হয়েছে।সে সুন্দরী,অথচ স্বামী সাহচর্য থেকে বঞ্চিতা।স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে সে যে অসহনীয় দুঃখের ভাগীদার হয়েছে তাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে কাঞ্চনের উপস্থিতি।ইংরেজী শিক্ষিত স্বামী মদ্যাসক্ত,চরিত্রহীন,উপরন্তু বারাঙ্গনা-বিলাসী,যা একজন স্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট অবমাননাকর।অটল তার প্রতিটি আচরণেই কুমুদিনীর যাবতীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে।তার জীবনের শেষ বিড়ম্বনাটি ঘটেছে যখন অটল গোকুলবাবুর স্ত্রী মনে করে হিজরে দিয়ে তাকে হরণ করেছে।অটলের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি বোধগম্য হলে সে নিদারুণ মর্মাহত হয়েছে।এর পূর্বে সে আপন বৈধব্য কামনা করে খেদোক্তি করেছিল।এখন অপমানে,আত্মগ্লানিতে সে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে।

এইভাবে কয়েকজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের জীবনের দুঃখময় পরিণতির কথা নাট্যকার আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন,যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কুমুদিনীর বিয়োগবেদনা।সধবা হয়েও স্বামী এবং সমাজের দ্বারা নিদারুণভাবে অবহেলিতা নারীর জীবনে বৈধব্যের অভিশাপ নেমে এসেছে।ব্যাপক মদ্যাসক্তি এবং সভ্যতার নামে যৌবনের অপচয় সেই যুগের একটি বিশিষ্ট প্রবণতা যার চিত্র আমরা মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকে প্রত্যক্ষ করি।কুমুদিনীর মতো অসংখ্য নারীর দাম্পত্য ও বেঁচে থাকা এর ফলে অর্থহীন হয়ে গিয়েছে।সেই বিয়োগাত্মক পরিণামকে স্মরণ করেই নাট্যকার এই নাটকের নামরকরণ করেছেন,যা নাট্যবিষয়ের সাথে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

৯.৪ অনুশীলনী

১. 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রধান আকর্ষণ নিমচাঁদ - এই মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

২. 'সধবার একাদশী' নাটকের গঠনরীতি সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৩. 'সধবার একাদশী' নাটকে কাঞ্চন এবং কেনারাম ডেপুটি চরিত্রের যৌক্তিকতা বিচার কর।একই সাথে নাটকে অটল চরিত্রের সার্থকতা কোথায় দেখিয়ে দাও।

৪. নাটকের ক্ষেত্রে নামকরণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ?আলোচ্য নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু কোন ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন ব্যাখ্যা কর।

৯.৫ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড.অজিতকুমার ঘোষ

২. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস(১ম ও ২য় খণ্ড) - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র - ড.সুশীলকুমার দে

৫. দীনবন্ধু রচনাবলী - ড.ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

৬. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭. দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী : পর্যালোচনার আলোকে - সুজয় বসাক

৮. আশার ছলনে ভুলি - উৎপল দত্ত

৯. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক - গোলাম মুরশিদ

১০. ইন্টারনেট

একক ১০ – 'সধবার একাদশী' – গোত্র নির্নয়, উদ্দেশ্যমূলকতা, সংলাপ এবং অশ্লীলতা

বিন্যাস ক্রম

১০.১ গোত্র নির্ণয়

১০.২ উদ্দেশ্যমূলকতা

১০.৩ সংলাপ

১০.৪ অশ্লীলতা

১০.৫ অনুশীলনী

১০.৬ গ্রন্থঋণ

১০.১ গোত্র নির্ণয়

'সধবার একাদশী' নাটকটি প্রহসন নাকি কমেডি সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।এ বিষয়ে একাধিক সমালোচক তাঁদের আলোচনা পেশ করেছেন।প্রহসনে স্থূল ভাঁড়ামি এবং হাস্য-পরিহাস এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক দুর্নীতি-অবিচার-অনাচার-ভন্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা শ্রোতাদের মনে স্থূল আমোদ সৃষ্টি করা হয়।অন্যদিকে কমেডি মূলত মানুষের চরিত্রের যে কৌতুকাবহ দিক তার পরিস্ফুটন।এই কৌতুকের জন্ম মানুষের কাজ বা জীবনের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে।কমেডির হাস্যরস দর্শককে আনন্দ দেয়।সেখানে কোন চরিত্রের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয় ঠিকই,কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একটি পরিমিতিবোধ রক্ষিত হয়ে থাকে।রঙ্গ-ব্যঙ্গ থাকলেও কমেডি কোনভাবেই অশ্লীলতা বা ইতরতাকে প্রশ্রয় দেয় না।কিন্তু প্রহসনে উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টায় নাট্যকার

চরিত্রগুলিকে বাস্তবের তুলনায় অতিরঞ্জিত করে অঙ্কন করেন এবং উদ্ভট ও বিসদৃশ পরিস্থিতি নির্মাণ করেন।এই অতিরঞ্জিত ঘটনার আশ্রয়ে চরিত্রদের আচরণকেই প্রহসনে গুরুত্ব দেওয়া হয়।কমেডিতে চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি,অসঙ্গতিগুলি দেখালেও সেখানে ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতাকে কখনোই বিঘ্নিত করা হয় না।

কমেডি উচ্চ এবং লঘু দুই পর্যায়েরই হতে পারে।উচ্চ পর্যায়ের কমেডিতে চরিত্রের বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে যুগচিত্র ও সামাজিক সমস্যার প্রকৃতিটিও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে।'সধবার একাদশী' নাটকে যুগসমস্যার স্বরূপ উদঘাটিত হলেও নাটকে হাস্যরস উদ্ভূত হয়েছে মূলত চরিত্রের অসংগতি বা ঘটনার অতিরঞ্জনের থেকেই।মদ্যপ নিমচাঁদের রাস্তায় শুয়ে পড়া এবং সেই শয্যাকে ওথেলোর ভাষায় 'Thrice driven bed of down' বলে অভিহিত করা,কাঞ্চনের প্রতি অভিমানবশত অটলের গলায় রুমাল দিয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা,ভোলাচাঁদের বিকৃত ইংরেজি উচ্চারণ,রামমাণিক্যের মূর্খতা বা নিমচাঁদের সম্মুখে কেনারাম চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন - এই সমস্ত কিছুই নাটকটিতে প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

প্রহসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে টাইপ চরিত্রের উপস্থিতি,তা এই নাটকে প্রত্যক্ষ করা যায়।আবার কমেডিতে যে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে সামাজিক মানুষের মনোভাব ব্যক্ত করা হয়ে থাকে,তার দৃষ্টান্তও এই নাটকে বিরল নয়।এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমচাঁদের মধ্যে দিয়ে সময়ের অসঙ্গতিটি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।নিমচাঁদ শুধু মাতাল নয়,সে সুশিক্ষিত,ইংরেজী সাহিত্যে তার বিশেষ দখল রয়েছে।অথচ সামাজিক স্বীকৃতি এবং অর্থের অনুপস্থিতিতে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।তার সংলাপে বাগবৈদগ্ধ এবং বুদ্ধিদীপ্ততার দ্যুতি রয়েছে।আত্মসচেতনতা তার মধেযে জন্ম দিয়েছে পরম গ্লানির।সে অটলের মতো বিকৃত রুচির অধিকারী নয়।আবার নিজের মদ্যাসক্তি এবং কুসংসর্গকে সে অন্যের থেকে আড়াল করতেও উৎসাহী নয়।কেনারাম বা অটলের বিদ্যে যে তার তুলনায় সামান্য সেই সম্পর্কে তার অবগতি রয়েছে।অটল তার কাছে আস্তাবলের বাঁদর,কেনারাম ডেপুটি arrant coward,রামমাণিক্য বুদ্ধিহীন

গর্দভ।ইংরেজী সাহিত্যে অনায়াস বিচরণ তাকে নিজের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান করেছে।অথচ অকৃতার্থতার ফলে তার জীবনে সঞ্চারিত হয়েছে নৈরাশ্য।আকাঙ্খা ও প্রাপ্তি,সাধ এবং সাধ্যের টানাপোড়েনে সে বিপর্যস্ত।আলোচ্য নাটকের নিরিখে সে নিঃসঙ্গ,একক চরিত্র।অটলের সাথে তার প্রকৃতিগত ভেদ রয়েছে।তবু অটল এবং তার মধ্যে সংযোগের একটি সেতু রচনা করেছেন নাট্যকার,যে কারণে আমরা এই দুটি চরিত্রকে একে অপরের পরিপূরক বলে মনে করি।সময়ের অসঙ্গতিই অটলের সমগ্র জীবনের অপচয় এবং নিমচাঁদ চরিত্রের অচরিতার্থতার মধ্যে সম্পর্কসূত্রটি স্পষ্ট করেছে।তাদের মধ্যে কেউই যুগসঙ্কটকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।ধনীর সন্তান অটল নব্য ইংরেজীয়ানার বাহ্য চাকচিক্যকে অনুসরণ করতে গিয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা সভ্যতার পরিপন্থী।আবার নিমচাঁদ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েও অধঃপতিত জীবনযাত্রার শরিক।তার চরিত্রের অনিবার্য পরিণতি আমাদের মনে যুগপৎ হাস্য এবং বেদনার জন্ম দেয়।নিমচাঁদের আত্মসচেতন দ্বন্দ্বক্ষত স্বরূপটি অনুভব করে তাই অনেকেই তাকে উচ্চ কমেডির চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।কিন্তু তাকে বাদ দিলে নাটকের অন্য কোন চরিত্রেই পরিণতির আভাস স্পষ্ট নয়।ভোলাচাঁদ,রামমাণিক্য বা কেনারামের উপস্থিতি নাটকে কেবলমাত্র প্রমত্ত রঙ্গরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।তাদের প্রতিটি আচরণ আমাদের কাছে হাস্যকর বলে পরিগণিত হয়।সেই হাস্যরস সর্বক্ষেত্রে নির্মল নয়,বরং তার অনেকাংশেই স্থূলতার বহিঃপ্রকাশ অনুভব করা যায়।সামগ্রিকভাবে বাস্তবসচেতন দীনবন্ধু অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের আমাদের সামনে হাজির করেছেন।বাবু সম্প্রদায়ের উন্মার্গগামী যুবক,মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী,ধনীর দয়াপ্রার্থী জামাতা,হাস্যাস্পদ কেবলা হাকিম,অভিজাত গণিকা সমস্ত চরিত্রাঙ্কনেই নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় প্রদান করেছেন।আলোচ্য নাটকটির কাহিনী রহস্যময় বা জটিল নয়,ঘটনা সন্নিবেশে পূর্বাপর যোগও রক্ষিত হয়নি,যদিও প্রায় একই পরিবেশে সংঘটিত নাট্যঘটনায় একটি অখণ্ডতার আভাস রয়েছে।সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করার কোন স্পৃহা এই নাটকে পরিলক্ষিত হয় না।মূলত জীবনের খণ্ডাংশকেই এই নাটকে অতিরঞ্জিত করে অঙ্কন

করা হয়েছে।নাটকটির উদ্দেশ্যমূলকতা সম্পর্কে নাট্যকার পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের মন্তব্যটিও স্মরণীয়,তাঁর মতে -

"শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজশরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিত মণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন।সেই দর্পণ 'সধবার একাদশী'।"

- প্রকৃতপক্ষে 'সধবার একাদশী' নাটকে সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ভণ্ডামীকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে নাট্যকার দর্শকের মধ্যে উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।নাটকটির কাহিনী সংক্ষিপ্ত,তার মধ্যে বিস্তার বা জটিলতাও দেখা যায়না।মনোরঞ্জনের সাথে সাথে এই নাটক দর্শককে আত্মশোধনের পথটিও দেখিয়ে দেয়।নাটকের অধঃপতিত চরিত্রগুলির প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতির পরিচয় এখানে দুর্লভ নয়।সেই সহানুভূতি ক্রমেই পাঠক বা দর্শকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।কমেডির আদর্শ বহুলাংশে গৃহীত হলেও সমস্ত দিক বিচার করে ড.অজিতকুমার ঘোষের মতো সমালোচক শেষ পর্যন্ত এই নাটকের প্রহসনধর্মীতার দিকটিকেই মান্যতা দিয়েছেন।

১০.২ উদ্দেশ্যমূলকতা

সামাজিক সমস্যানির্ভর নাটক অনেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে। প্রত্যেক সফল নাট্যকারই সমস্যাগুলিকে সূক্ষ্ম নাট্যকৌশলের সাহায্যে পরিবেশন করেন।ফলে সমাজ সমস্যা নাটকে প্রকটভাবে চিত্রিত হয় না।যে সমাজ সমস্যাকে ভিত্তি করে নাটক রচিত হয় তা একটি নির্দিষ্ট যুগের হলেও তার মধ্যে চিরকালীনতার ইঙ্গিত থাকে।দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকটিও রচনার গুণে এমনই সর্বকালীন মহিমা লাভ করেছে।

দীনবন্ধু মিত্রের গুরুত্বপূর্ণ সৃজন 'নীলদর্পণ' নাটকেও সমাজ সমস্যার পরিচয় বিধৃত রয়েছে।নীলকর সাহেবদের শোষণ,অত্যাচারের নগ্ন স্বরূপকে উন্মোচিত করলেও এই নাটকটি নিছক প্রচারধর্মী রচনায় পর্যবসিত হয়নি।মানসিকভাবে নির্লিপ্ত থেকেই দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এর কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন।চরিত্রের সাথে একাত্মতা তার নাটককে সৌকর্যমণ্ডিত করেছে।'সধবার একাদশী' নাটকটির ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য সমানভাবে কার্যকর।তৎকালীন সমাজের একটি প্রধাধনতম সমস্যাকে এই নাটকে চিহ্নিত করা হয়েছে।ধনীর দুলাল বাবু সম্প্রদায়ের অধঃপতিত জীবনযাত্রা,মদ্যাসক্তি,বারাঙ্গনা-বিলাস,রুচিবিকৃতিকে এই নাটকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।যদিও সেই ব্যঙ্গের মধ্যে কোথাও মানববিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়নি।মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটকে যেমন সভ্যতার নামে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অসংযত,ভ্রষ্ট জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়,তারই আদর্শে দীনবন্ধু অটলবিহারী,ভোলাচাঁদ,রামমাণিক্য বা কেনারামের মতো চরিত্রের নির্মাণ করেছেন।এরা তৎকালীন সময়ের অসঙ্গতির ফসল।কোনরকম সুস্থ আদর্শের প্রকাশ এদের মধ্যে অনুপস্থিত।শুধুমাত্র নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্যেই আত্মসমীক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।সে মাতাল হলেও রুচিবান,ইংরেজী শিক্ষা তার চরিত্রে মধ্যে যে মত্ততা জাগিয়ে দিয়েছে তাকে সে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তার সামাজিক ও পারিবারিক জীবন বিপন্ন।পরনির্ভরশীল হয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকা তার মধ্যে যে যন্ত্রণার জন্ম দিয়েছে তা এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রের থেকে তাকে পৃথক করেছে।নিজস্ব জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে কোনরকমের পাপকাজ থেকে বিরত থেকেছে।তার মধ্যে সমকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মানসিক আলোড়নের দিকটি মূর্ত হয়েছে।এখানেই সে একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধি হয়েও যুগকে অতিক্রম করে গিয়েছে।

'সধবার একাদশী' নাটকে অটলের জীবনের অপচয় মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে দর্শককে সতর্ক করে।ইংরেজী শিক্ষার উজ্জ্বল দিকসমূহকে অস্বীকার করে অপরিমিত মদ্যপান কীভাবে চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করে তার নিদারুণ চিত্র এই নাটকে

রয়েছে।নাটকের শুরুতেই নাট্যকার নিমচাঁদের মুখে এলিবু বারেটের উক্তি ব্যবহার করে নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা ব্যক্ত করেছেন।দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র এই নাটকের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন -

"তদানীন্তন সমাজের দুর্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল।বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যত অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের অাশ্রয় লইলেন।এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যান হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধারণ করিলেন।"

- অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সেই সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের জীবন অর্থহীন অপচয়ের গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল।বিত্তবান বাবু সম্প্রদায়ের লোকেরা মদ খাওয়াকে সংস্কারমুক্তির প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করতেন।এই সমস্যাকে প্রতিহত করতে সে সময় প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে সুরাপান-নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'সধবার একাদশী' প্রকাশের পর স্বয়ং প্যারীচরণ সরকার দীনবন্ধুর সাথে দেখা করে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।মদ্যপান বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের কার্যে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করেছিল।একইসাথে মধুসূদনের নির্দেশিত পথে বাঙালির নকল ইংরেজ হয়ে ওঠার যাবতীয় অপচেষ্টার প্রতি এই নাটক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের চাবুক নামিয়ে এনেছিল।মদ্যপান বিরোধী প্রচার কার্যে সহায়ক হলেও সেই সময়ের রক্ষণশীল সমাজ খোলা মনে এই নাটককে গ্রহণ করতে পারেনি।তারা নাটকটির প্রচার-প্রসারে আতঙ্কিত হয়ে নাটকটিকে অশ্লীল বলে দাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।যদিও সে সমস্ত অভিযোগ নাটকটির অগ্রগতিকে রোধ করতে পারেনি।বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত এই নাটকে সনাতন এবং নবীন সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে সৃষ্ট যুগযন্ত্রণার চিত্রাঙ্কন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এই নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতাকে স্বীকার করে নিয়ে মন্তব্য করেছেন -

"দীনবন্ধুর যে অনুভূতিশীল হৃদয় একদিন পল্লীর নীল-চাষীদের দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া কাতর হইয়াছিল,তাহাই সমসাময়িক নাগরিক সভ্যতার এক কদর্য রূপ দেখিয়া সেদিন

ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।'সধবার একাদশী'র মধ্য দিয়া তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিয়াছে।সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ইতিপূর্বেই এদেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।দীনবন্ধু তাহারই সূত্র ধরিয়া সেকালের শিক্ষিত নব্য বাংলার একটি জঘন্য দুর্নীতির ও তার শোচনীয় পরিণামের প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।"

১০.৩ সংলাপ

অ্যারিস্টটল নির্দেশিত ট্রাজেডির ছয়টি উপাদানের মধ্যে ভাষা বা সংলাপ অন্যতম।ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটিত হয়।এছাড়া ঘটনার অগ্রগতিতে সংলাপের ভূমিকা রয়েছে।সংলাপ সর্বদা বস্তুনিষ্ঠ এবং চরিত্রানুগ হওয়া প্রয়োজনীয়।চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সংলাপ পাঠক দর্শকের মনে অনুভূতির সঞ্চার করতে পারে না।সংলাপের একটি অন্যতম দিক হলো তাই ঔচিত্যবোধ।প্রহসনে সংলাপের কৌতুকাবহ দিকটির উপরেই জোর দেওয়া হয়।'সধবার একাদশী' নাটকেও এই প্রবণতা স্পষ্ট।আসলে একটি চরিত্র নির্মাণের সময় নাট্যকার তার মুখে যেমন খুশি সংলাপ বসাতে পারেন না।নির্মিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রত্যেকটি চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে যায়।এই বৈশিষ্ট্যগুলিই পরবর্তীকালে চরিত্রটির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী চরিত্রের ভিন্নতা সংলাপের মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ফুটে না উঠলে নাটকের শিল্পমূল্য হ্রাস পায়।তাই সংলাপ সৃজনে নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়।

আলোচ্য নাটকে অটল,নিমচাঁদ,ভোলাচাঁদ,রামমাণিক্য,কেনারাম সকলের সংলাপের মধ্যেই নাট্যকারের তীক্ষ্ণ সমাজ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।নিমচাঁদ সুশিক্ষিত ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অবাধ বিচরণ অথচ সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে তার জীবন বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে।নিমচাঁদের প্রতিটি সংলাপের মধ্যেই তার শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচিবোধের পরিচয় মেলে।তার কথা একদিকে যেমন হাসির

উদ্রেক করে,তেমনভাবেই তার বাগবৈদগ্ধ ও বুদ্ধিমত্তা আমাদের মনে তার প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলে।আবার আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত নিমচাঁদের সংলাপে কখনও লুকিয়ে থাকে তার যন্ত্রনাময় সত্তার পরিচয়।তখন আমরা সমবেদনাবশত তার প্রতি একাত্মতা অনুভব করি।সামগ্রিকভাবে বাস্তবতাবোধের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ততা ও ব্যঙ্গ মিশ্রিত হয়ে তার কথাগুলিকে পাঠকের কাছে মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ভোলাচাঁদ ধনীর জামাতা।অটলের মতোই তার বিদ্যের দৌড় অল্প।অল্প বয়সে কুসংসর্গে সে গুলি এবং মদের নেশায় লিপ্ত হয়েছে।মাতৃভাষায় কথা বলবার তীব্র অনীহার কারণে সে সর্বক্ষেত্রে উৎকট এবং বিকৃত ইংরেজির ব্যবহার করে।তবে কৃত্রিম এবং অশুদ্ধ হলেও ইংরেজীর ব্যবহারে সে ডেপুটি কেনারামের তুলনায় স্বচ্ছন্দ।তার কথাবার্তা,আচার-আচরণ,সাজপোশাক আমাদের মনে উদ্দাম হাস্যরসের জন্ম দেয়।তবে কিছু ক্ষেত্রে মানব চরিত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার দিকটিও সংলাপের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।যেমন বাঙাল রামমাণিক্যকে দেখে সে ছড়া কেটে বলেছে -

"বাঙ্গাল পুঁটি মাছের কাঙ্গাল

বাঙ্গাল গঙ্গাজলের কাঙ্গাল

বাঙ্গাল ডেঙ্গা পথের কাঙ্গাল

বাঙ্গাল ভাল কথার কাঙ্গাল"

- রামমাণিক্যকে বাঙাল বলে সম্বোধন করলে সে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়।তার কথাবার্তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিধ্বনিত হয়েছে -

"পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর্যা মস্তক গুরাই দিচে - বাঙ্গাল কউস ক্যান - এত অকাদ্য কাইচি তবু ক্কলকত্বার মত হবার পারচি না?ক্কলকাত্বার মত না করচি কি?মাগীবারী গেচি,মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি,গোরার বারীর বিসকাট বক্কোন করচি,বাণ্ডিল খাইচি - এতো কর্যাও ক্কলকত্বার মতো হবার পারলাম না,তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি,আমি জলে জাপ দিই,আমারে হাঙ্গোরে কুমিরে বক্কোন করুক।"

- কেনারাম ডেপুটির সংলাপও তার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। সে মূর্খ, অথচ আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ।কাছাড়ির সকলের কাছে সে নির্বুদ্ধিতার কারণে উপহাসের পাত্র।তার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিমচাঁদের একটি মন্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়েছে -

"সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি.."

- সে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, অথচ সে হিন্দুর দেবমন্দিরে প্রণামী দেয়।অন্তঃসারশূন্য হলেও নিজের পদমর্যাদার জন্য সে অহংকার অনুভব করে।এই মর্যাদা রক্ষার জন্যই সে তার চরিত্রের সমস্ত অসঙ্গতিকে অন্যের কাছে আড়াল করতে চায়।ঘটিরাম ডেপুটি কতটা নির্বোধ তা তার সংলাপের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন নিমচাঁদ তাকে বাংলা বাক্যের ইংরেজী তর্জমা করতে বলে -

"আমি যখন তরজমা করি,তিন চারখানা ডিক্সোনারী নিই আর এক একটা মৎত্রজ্জমকে জিজ্ঞাসা করি - এখানে বসে তরজমা কত্তে পারিনে।"

- নাটকে নারীচরিত্রগুলির পরিকল্পনার সাথে তাদের মুখের ভাষা সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে।এক্ষেত্রে অনেকাংশে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শ গৃহীত হয়েছে।অটলের জননীর সংলাপে পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধতার লক্ষণ স্পষ্ট।একমাত্র সন্তানের রুচিবিকারে তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে।সবটাই তিনি করেছেন পুত্রস্নেহের দোহাই দিয়ে।কুমুদিনী অর্থাৎ অটলের স্ত্রীর সংলাপে তার অপরিসীম নৈরাশ্য,ব্যর্থতাবোধ এবং আত্মগ্লানির পরিচয় রয়েছে -

"বাবা বড় মানুষ দেখে বিয়ে দিলেন, টাকা নিয়ে আমি ধুয়ে খাবো, মরণটা হয় বাঁচি।"

- সৌদামিনীর সঙ্গে তার কথোপকথনে ননদ-ভাজের রঙ্গরসিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।কিছু ক্ষেত্রে রুচিকে আহত করলেও যুগের নিরিখে তাদের পারস্পরিক সংলাপ বস্তুনিষ্ঠ।কাঞ্চনের মুখের ভাষাতে একজন অভিজাত গণিকার গর্বোদ্ধত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে।অটল যখন তার প্রতি তীব্র ভাবাবেগ প্রকাশ করেছে,সেই সময়েও অচঞ্চল এবং নির্লিপ্ত আচরণ তার স্বভাব-স্বাধীন ও বহুচারী মানসিকতাকেই প্রতিফলিত

করেছে।পিশাচী বা দেবী নয়,সে নিজের ব্যবসায় সম্পর্কে তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন একজন পণ্যা নারী।ফলে তার সংলাপে অন্যান্য নারীচরিত্রের তুলনায় স্বাতন্ত্র্য আরোপিত হয়েছে।

১০.৪ অশ্লীলতা

'সধবার একাদশী' নাটকে নব্য সভ্যতার ধ্বজাধারী ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের নিখুঁত চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।নকল সাহেব হয়ে ওঠার তীব্র বাসনা বাবু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণের জন্ম দিয়েছে নাট্যকার তাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন।এর বিপরীতে গড়ে ওঠা সংস্কারমূলক আন্দোলনের অসাড়তাকেও নাট্যকার বিদ্ধ করেছেন।এই নাটকে উদ্দাম হাস্যরস সৃষ্টির একাধিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়,যা একালের রুচির বিচারে অশ্লীল বলে মনে হতে পারে।কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল,নাটকটি তৎকালীন রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের লোকেদেরও মনঃপূত হয়নি।স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রুচির কারণে নাটকটির প্রকাশ থেকে নাট্যকারকে বিরত থাকতে বলেছিলেন।সেকালে গোঁড়া তিলককাটা সমালোচকদের এই নাটক ক্ষুণ্ণ করেছিল।রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন -

"ইহার আদ্যোপান্ত কেবল বখামি ও মদের কথাতেই পরিপূর্ণ।"

- দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পরিচালিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় দীনবন্ধুর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কেই মন্তব্য করা -

" 'নীলদর্পণে'র নামটি ব্যতীত(ইহাও সাহিত্য নয়,রাজনীতি সম্বন্ধে) আর একখানিও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের হস্তে যাইবে না।....একদল কুরুচিবিশিষ্ট লোকে তাঁহাকে কবি বলিয়া জ্ঞান করেন,কেহ তাঁহার বক্রকবিতা,অশ্লীল ভাষা ও গ্রাম্য রসিকতার অনুসরণ করিতেছেন।কৃতবিদ্যমণ্ডলী অবশ্যই 'জামাই বারিকে'র ন্যায় অসম্ভব ও অশ্লীল গল্পপাঠে ঘৃণা করেন....।দীনবন্ধু ছেবলা লেখক,ছেবলাদিগকে সন্তুষ্ট করা তাঁহার অভিপ্রেত....।"

- ইংরেজী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র মতো ব্যক্তিত্বও খ্রিষ্টান পিউরিটানিজমের দিক থেকে 'সধবার একাদশী'কে বিচার করেছিলেন।ফলে নাটকটি তাঁর কাছেও অশ্লীল বলে প্রতিভাত হয়েছিল -

"....if this trash be ever put on the stage, we can'nt recommend a better place for the performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons..."

- বোঝাই যায় যে আলোচ্য নাটকটি সমাজের সব মহলের সমর্থন আদায় করতে পারেনি।এই জাতীয় সমালেচনাগুলির জন্যই পরবর্তীতে নাটকটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়,যা বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে অত্যন্ত লজ্জাকর ঘটনা।আসলে নাটকের আদর্শটিকে অনুভব করার জন্য সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্ন হওয়া জরুরী।এই রসবোধের অভাবহেতু নাটকটি সেকালেও যেমন অনেকের কাছে সাহিত্যিক স্বীকৃতি আদায় করতে পারেনি,তেমনি আজকের দিনে দাঁড়িয়েও অনেকে এই নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ করেছেন।আসলে অশ্লীলতার ধারণা সুগের নিরিখে বদলে যায়।মনে রাখা দরকার নাটক রচনায় স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলকতা থাকলেও দীনবন্ধু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবেই চরিত্র এবং ঘটনার নির্মাণ করেছেন।এব্যাপারে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই অনুসরণ করেছেন।ফলে যুগরুচি তাঁর নাটকে বস্তুনিষ্ঠভাবেই ফুটে উঠেছে।ভারতচন্দ্র-উত্তর বাংলায় মানুষের মন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণে কলুষিত হয়েছিল।উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সমাজে নিন্দিতরুচি এবং অশ্লীলতার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।খেউড়,কবিগান,পাঁচালি বিভিন্ন আঙ্গিকগুলি মানুষের বিকৃতরসলিপ্সার চাহিদাকে সন্তুষ্ট করেছিল।ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে এই বিকৃতি গ্রাম থেকে শহরের অল্পশিক্ষিত বাবু ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।এই রুচিহীনতা এবং নীতিশৈথিল্য মূলত সভ্যতার ছদ্মবেশে শিক্ষিত শহরবাসীর মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট সামাজিক আলোড়নকে শান্ত করবার কোন উপায় তখনো আবিষ্কৃত হয়নি।সমাজ একটি নির্দিষ্ট

জীবনবোধের ভিত্তিতে সংঘাত নিরসনের পথ খুঁজে নিতে পারেনি।দীনবন্ধু এই যুগযন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।ফলে তাঁর নাটকে বিকৃত গ্রাম্য সমাজের পাশাপাশি কলুষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি জীবনের অসঙ্গতিগুলিকে চিহ্নিত করেছেন,প্রয়োজনে সমাজের রুচিবিকৃতিকেও বাস্তবম্মতভাবে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন।সেই কারণে তাঁর নাটকের কোন অংশ অশ্লীল মনে হলেও তা মূলত তৎকালীন যুগজীবনকেই অনুসরণ করেছে।

১০.৫ অনুশীলনী

১. 'সধবার একাদশী' নাটকটি কী ধরনের নাটক? এই নাটকের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে আদর্শ প্রহসন হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় কোন কোন বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে বর্ণনা কর।

২. 'সধবার একাদশী' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক হলেও স্রেফ প্রচারধর্মী নয় - এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩. 'সধবার একাদশী' নাটকের সংলাপ বিচার করে তা নাটকের চরিত্রগুলির সাথে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে তা বর্ণনা কর।

৪. 'সধবার একাদশী' নাটকটি কতটা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট সে ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর এবং নিজের উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১০.৬ গ্রন্থঋণ

১. বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড.অজিতকুমার ঘোষ

২. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৩. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস(১ম ও ২য় খণ্ড) - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র - ড.সুশীলকুমার দে

৫. দীনবন্ধু রচনাবলী - ড.ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

৬. বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন - ড.আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭. দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী : পর্যালোচনার আলোকে - সুজয় বসাক

৮. আশার ছলনে ভুলি - উৎপল দত্ত

৯. সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক - গোলাম মুরশিদ

১০. ইন্টারনেট

একক ১১ – 'টিনের তলোয়ার' – নাট্যকার পরিচিতি, উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি

বিন্যাস ক্রম

১১.১ ভূমিকা

১১.২ নাট্যকার পরিচিতি

১১.৩ উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি

১১.৪ অনুশীলনী

১১.৫ গ্রন্থঋণ

১১.১ ভূমিকা

টিনের তলোয়ার নাটকটি উৎপল দত্তের পরিচালনায় ১২ই আগস্ট,১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পিপলস্ লিটল থিয়েটারের প্রযোজনায় কলকাতা শহরে ,রবীন্দ্রসদন মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়।পিপলস্ লিটল থিয়েটারের এটি প্রথম প্রযোজনা।জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে এই নাটকটি প্রথম প্রকাশ করেন।নাটকটি হিন্দী ভাষায় 'টীন কি তলবার' নামে অনামিকা বিমল্লাঠ ও পরে দেবকান্ত শুক্লা প্রযোজনা করে মঞ্চস্থ করেন।উনবিংশ শতকে ,অপরিসীম আত্মত্যাগে যাঁরা বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলেছিলেন - এই নাটক তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।নাটকের মুখবন্ধে, উৎপল দত্ত লিখেছেন -

"বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে- যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্থ সমাজের কোন নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান

ও লাঞ্ছনা।যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই ।যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহবরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়বেদনাকে দিয়াছিল বিদ্রোহ-মূর্তি।যাঁহারা বহু পত্রপত্রিকা,বহু বাচস্পতিশিরোমণি, বহু রাজা-মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত,যাঁহারা অপাংক্তেয় ছোটলোকের আশীর্বাদ-ধন্য,যাঁহারা ভালবাসার বিশাল আলিঙ্গন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ।যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া,বাঁধনহারা।যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ।যাঁহাদের মদ্যসিক্ত অঙ্গুলিস্পর্শে ছিল বিশ্বকর্মার জাদু।যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালীর নাট্যশালা,জাতির দর্পণ,বিদ্রোহের মুখপত্র।যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্রসদৃশ পূর্বসূরী।"

১১.২ নাট্যকার পরিচিতি

প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার,অভিনেতা,নির্দেশক এবং প্রাবন্ধিক উৎপল দত্ত ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ অবিভক্ত বাংলার বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।নিজের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য -

"আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনো আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে।তবে আমি মনে করি আমি প্রপাগাণ্ডিস্ট।এটাই আমার মূল পরিচয়।"

- উৎপল দত্ত নাটককে গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নাট্যরচনা ও অভিনয় করে গিয়েছেন।তাদের রাজনৈতিক,মানসিক,সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে তাঁর নাটক সেই সময়ের মতে আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।সূক্ষ্ম ব্যঙ্গবিদ্রূপ,সংলাপের চমৎকারিত্বে তাঁর নাটক একদিকে মানুষকে আনন্দদান করেছে,তেমনি তার মন ও মননে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে।মার্কসবাদী মতাদর্শের অনুসারী উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটকেই রাজনীতির প্রভাব সুবিদিত।তাঁর নাটকে শাসনযন্ত্রের প্রতি এক বিরামহীন বিরুদ্ধতার আঁচ পাওয়া যায় যা তাঁর পাঠক বা দর্শকের মনোজগৎকে আলোড়িত করে তোলে।মঞ্চ নাটকের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার অদম্য বাসনা তাঁর নাটকগুলিকে অনন্যতা এনে দিয়েছে।শ্রেণী ও

ইতিহাস চেতনার ভিত্তিতে তাঁর অসাধারণ নাটক সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'টিনের তলোয়ার', 'রাতের অতিথি', 'ছায়ানট','সূর্যশিকার','মানুষের অধিকার','টোটা','লালদুর্গ','তিতুমীর','কল্লোল', 'দিল্লি চলো','ক্রুশবিদ্ধ কুবা','ব্যারিকেড','জনতার আফিম','অজেয় ভিয়েতনাম' ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা 'কল্লোল'(১৯৬৮) উৎপল দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক।এর মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে ভারত ছাড়ো আন্দোলন,আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে নৌ-বিদ্রোহের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই বৈপ্লবিক আন্দোলনটিকে শুধুমাত্র জাতীয় সংগ্রামের অঙ্গীভূত হিসেবেই নাট্যকার দেখেননি,বরং তাকে স্থাপন করেছেন শ্রেণীসংঘর্ষের জ্বলন্ত পটভূমিকায়।রাজনৈতিক তাত্ত্বিকতা পেরিয়েও এই নাটকে তিনি নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন।উৎপল দত্তের নিজস্ব ভাষ্যে পাওয়া যায় -

"৪৬-এর নৌ-বিদ্রোহ এক বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সূচনা।এই সেই প্রক্রিয়া যা ব্রিটিশকে কংগ্রেস-মুসলিমলিগ চক্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করতে বাধ্য করলো স্বতঃসিদ্ধভাবে।ইতিহাসের প্রক্রিয়াই তাই।এই সেই প্রক্রিয়া এবং ষড়যন্ত্র যাতে সমগ্র ভারতবর্ষটাই প্রজ্জ্বলিত হলো বিদ্রোহে।এই সেই প্রক্রিয়া যার অমোঘ নিয়মে ভারতীয় বুর্জোয়া সশস্ত্র সংগ্রামের দুঃস্বপ্নে আজও ভীত। এই প্রক্রিয়া বৈপ্লবিক স্বপ্নের।বিপ্লবের।তাই থিয়েটারের বর্ণমালায় 'খাইবার' আত্মসমর্পণ করেনি,যেমন আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেনশিপ পোটেমকিন'-এ করেনি, যদিও ইতিহাস বলে করেছিল।.."

- পোটেমকিনের বিদ্রোহীদের মতো নৌ-বিদ্রোহের নায়কদের আত্মসমর্পণও ইতিহাসের নিরিখে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।এই নাটকের সব ঘটনাই ঐতিহাসিক এই অর্থে যে, ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহে যা ঘটেছিল তার প্রেক্ষিতেই এর সমগ্র কাহিনী বিন্যস্ত।তার মানে এই নয় যে খাইবার নামক জাহাজেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটে; নাট্যকার একাধিক

জাহাজের অভিজ্ঞতাকে একত্রিত করে একটিমাত্র জাহাজে সন্নিবিষ্ট করেছেন,তাকে বিশেষ রূপে উপস্থাপিত করেছেন।'খাইবার'এখানে মূলত একটি প্রতীক।সমস্ত বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধি সে।ইতিহাসের যে দিকটি এখানে উন্মোচিত হয়েছে সেদিকে তাকালে দেখা যায় কীভাবে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শক্তির সাথে মিলিত হয়ে নাবিকদের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়েছে।ব্রিটিশের সাথে হাত মিলিয়েই তারা এই আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছে।প্রকৃত ক্ষেত্রেও দেখা যায় নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতার দর-কষাকষিতেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন।কংগ্রেসের এই দেউলিয়া রাজনীতি নাটকে স্পষ্ট।

'ফেরারী ফৌজ' নাটকে স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় রাজনীতি ও আন্দোলনের চিত্রাঙ্কন লক্ষ্য করা যায়।বাংলার আন্দোলনের ইতিহাসে 'অগ্নিযুগ' নামে পরিচিত সেই বিশেষ কালপর্বটি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।ইতিহাসকে নতুন মাত্রায় উপস্থাপন করে তিনি আমাদের নাট্যরসপিপাসাকে তৃপ্ত করেছেন।'৬০-এর দশকে লেখা এই নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীদের সাহসী ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড।আবার ষাটের দশকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উত্থান-পতন,সংগ্রাম-বিচ্যুতির প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেই এই নাটকের বৃত্ত নির্মিত হয়েছে।স্বাধীনতা-উত্তরকালে বামপন্থীদের ওপর শাসক কংগ্রেসের দমন-পীড়ন তাকে অত্যাচারী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সমাসনে বসিয়েছে।অশোক এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র।শচী, বঙ্গবাসী, রাধারানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই যেন বিপ্লবী।এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে নাট্যকার আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অদম্য জেদ ও সাহসিকতাকে তুলে ধরেছেন।

'তিতুমীর' নাটকে কৃষকবিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে চব্বিশ পরগণার তৎকালীন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এজেন্ট ক্রফোর্ড পাইরন একজন মুক্তিকামী যোদ্ধা হিসেবে হাজির করেছেন।তিতুমীরের ঐতিহাসিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বাংলার প্রাচীন পুঁথি গবেষণায় মত্ত।নাট্যকার গবেষক হিসেবে ক্রফোর্ড

পাইরনের আপাত বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে তার ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টিকে সুনিপুণ দক্ষতায় মিলিয়ে দিয়েছেন।তিতুমীরের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী,ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তাঁকে একজন অতিকথার নায়কে পর্যবসিত করেছেন।তিতুমীরের চোখে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আর ধর্মরক্ষা করার সংগ্রাম সমার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে -

"যার যা আছে সব কিছু দিয়ে দিতে হবে, তবেই সে এই সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধার দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ত হবে।"

- 'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সেই দেশের সংগ্রামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত আমেরিকাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ মেহনতি মানুষ ও শ্রমিকশ্রেণীর গর্জে ওঠার চিত্র 'দিন বদলের পালা' নাটকে ধরা পড়েছে।'মানুষের অধিকার' ও 'লেনিনের ডাক'- নাটকদুটি কমিউনিসেট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা থিয়েটারের যে বিকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটেছে,তার অগ্রণী স্থপতিদের মধ্যে উৎপল দত্তের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।তিনি যুগস্রষ্টা নাট্যপরিচালক হওয়ার সাথে সাথেই একজন পরাক্রান্ত অভিনেতাও ছিলেন।নাটক সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা-ভাবনা,রাজনীতি ও থিয়েটারের নিবিড় অবিভাজ্য সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর অবিচল প্রত্যয়,সমাজ ও শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে তাঁর মতামত,তাঁর সৃষ্ট শিল্প ও তাঁর যাপিত জীবনের মধ্যেকার মিল ও অমিল এই সব কিছু এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে গড়ে ওঠা এক বিশাল ও দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন উৎপল।জীবদ্দশাকে অতিক্রম করে তাঁর মৃত্যুর পরে দুই দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সেই বিতর্ক সজীব ও অর্থময় হয়ে রয়ে গিয়েছে।তিনি শুধু বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তা-ই নয়,রেখে গিয়েছেন সৃষ্টির অমিত প্রাচুর্য।তাঁর সৃজনীপ্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক।নাটক রচনা ও প্রযোজনা ছাড়া নাটকের দল নির্মাণ করে একাধিক প্রজন্মকে তিনি সু-অভিনয়ের পাঠ দিয়ে গিয়েছেন।জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসেবে যাত্রাপালার

ভূমিকাকেও তিনি অগ্রাহ্য করেননি।তাঁর নান্দনিকতাবোধে কোন ধরণের ছুঁৎমার্গ ছিলো না।তিনি অসংখ্য পথ-নাটিকা রচনা করেছেন,যার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর দীপ্ত মনীষার স্পর্শ।বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই সমান সাবলীল এই তাত্ত্বিক নাট্যবিষয় অবলম্বনে একাধিক কালজয়ী নিবন্ধ রচনা করেছেন।নাট্যগ্রন্থ লেখার পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন।দেশে-বিদেশে তাঁর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাগুলি বর্তমানে নানান সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে।নাট্যমঞ্চের বাইরে তিনি অজস্র স্মরণীয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের অভিনেতা,একাধিক চলচ্চিত্রের নির্মাতা।এক দশকেরও বেশি সময় জুড়ে তিনি বাংলার নাট্যমঞ্চকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।মতাদর্শের প্রতি অবিচল লোকটিকে তাঁর সংগ্রামের ফলস্বরূপ কারাবরণও করতে হয়েছে।এমন বিরাট,বিচিত্র,জটিল এবং বর্ণময় চরিত্র দু'শো বছরের বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বিরল।পিপলস্ থিয়েটার এবং ভারতীয় গণনাট্যের নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা জনগণকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল করতে তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে।বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ছিল।সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজনৈতিক দলই যে বারংবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়,সে সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিহান ছিলেন।সেখানে জনগণের মুক্তির দিশা নেই।শ্রেণীসংঘর্ষের জ্বলন্ত অবস্থার মধ্যে দিয়েই জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসা সম্ভব।তাই বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে শোষণ মুক্ত অসাম্প্রদায়িক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে উৎপল দত্ত আমৃত্যু তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে জনতাকে সচেতন এবং শ্রেণি সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

১৯৪৭ সালে নিকোলাই গোগোলের 'ডায়মণ্ড কাটস ডায়মণ্ড' এবং মলিয়েরের 'দ্য রোগারিজ অফ স্ক্যাপাঁ' দিয়ে তাঁর কলেজ জীবনের অভিনয় শুরু।নাটক দুটি প্রযোজনা করেছিলেন কলেজের ইংরেজি অ্যাকাডেমির অধ্যাপক ফাদার উইভার।এর কিছুদিনের মধ্যেই উৎপল দত্ত ও তাঁর কলেজের কয়েকজন সহপাঠী মিলে গড়ে তোলেন একটি নাট্যদল - 'দি অ্যামেচার শেক্সপীয়রিয়ান্স্'।এই দলটির প্রথম উপস্থাপনা 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' এবং ম্যাকবেথ নাটকের নির্বাচিত অংশ।সেই সময়েই, ১৯৪৭-এর অক্টোবরে,

ইংলণ্ডের বিখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা জেফ্রি কেণ্ডাল তাঁর 'শেক্সপীয়রিয়ানা' নাট্যদল নিয়ে ভারত সফরে আসেন।কেণ্ডালের আহ্বানে উৎপল তাঁর সফররত দলে যোগদান করেন।১৯৪৭-এর অক্টোবর থেকে জানুয়ারি,১৯৪৮ পর্যন্ত শেক্সপীয়রিয়ানা নাট্যদল কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে তাদের প্রযোজনা মঞ্চস্থ করে।তাঁদের অভিনয়ের উৎকর্ষ নাট্যমোদীদের অভিভূত করেছিল।জেফ্রি কেণ্ডালের দলে নিয়মিত অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে উৎপল সেই সময় আত্মস্থ করেছেন ইউরোপীয় থিয়েটার দলের শৃঙ্খলা,নিয়মানুবর্তিতা।নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক হিসেবে তাঁর পরবর্তী জীবনে এই অভিনয় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।কেণ্ডালের কাছেই তিনি শিখেছিলেন - There is no art without discipline and no discipline without sacrifice.তাঁর কাছেই উৎপল শেক্সপীয়রের নাটকে অভিনয়ের বিশেষ দীক্ষা লাভ করেছিলেন।

সমসময়েই কেণ্ডাল-কন্যা জেনিফারের সঙ্গে উৎপল দত্তের পরিচয় রূপান্তরিত হয় প্রণয়ে।পরবর্তীকালে যাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ উৎপলের মধ্যে তীব্র মনোকষ্টের জন্ম দিয়েছিল।এই যন্ত্রণার রেশ তিনি আজীবন বহন করেছেন।তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে লিখেছেন একাধিক কবিতা।সহধর্মিণী শোভা সেনের কথন অনুযায়ী,উৎপলের কাছে কবিতা ছিল ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি অথবা কোনও তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম।আবৃত্তিশিল্পী হিসেবেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের লেখা কবিতার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ ‘জেলখানার চিঠি' আবৃত্তি অসামান্য দৃষ্টান্তকে কখনোই ভুলে থাকা যায়না।একইভাবে ‘পদ্মা নদীর মাঝি’তে হোসেন মিয়ার গায়ন,সুর আমাদের সবসময়ই তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

উৎপলের ছোটবেলায় পারিবারিক পটভূমি ও নানা বিরোধী স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক বালকের সৃষ্টিসত্তার জাগরণ ঘটতে দেখি আমরা।স্কুল ও কলেজে পড়ার সময়ে তাঁর নাট্যক্ষমতার বিকাশের পটভূমিটিও স্পষ্ট।ইংরেজ নাট্যব্যক্তিত্ব জেফ্রি কেণ্ডালের সঙ্গে সংযোগ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণ।এর মধ্যে দিয়েই তিনি পেশাদার

নাট্যশালার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন।পরবর্তী জীবনের পেশাদার নাট্যকর্মী হিসেবে উৎপলের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ও রূপান্তর এই দীক্ষার মধ্যে দিয়েই সূচত হয়েছিল।জেফ্রি কেণ্ডালকে 'গুরু' মেনে 'শেক্সপীয়রিয়ানা' দলে যোগ দিলেও উৎপল দত্ত তাঁদের নিজস্ব নাট্যদল 'দি অ্যামেচার শেক্সপীয়রিয়ান্স্' তুলে দেননি।বরং মাঝে মধ্যেই শেক্সপীয়র,বার্নাড শ,শেরিডান,প্রিস্টলি প্রমুখের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।সেই সময়েই উৎপল দত্ত অভিনেতা হিসাবে কলকাতার বিদগ্ধ নাট্যসমালোচক মহলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।এই পথেই ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে,কবি ও গায়ক দিলীপ রায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী,উৎপলরা তাঁদের দলের নাম পরিবর্তন করেন।নতুন নাম হয় লিটল থিয়েটার গ্রুপ - সংক্ষেপে এল টি জি।আন্তর্জাতিক লিটল থিয়েটার আন্দোলনের শরিক হিসেবে তিনি প্রথমে ইংরেজী ও পরে বাংলায় নাটকাভিনয় করলেন।১৯৫১ সালে নাট্যকার,অভিনেতা ও পরিচালক রূপে গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই তিনি মার্কসবাদী বিচারধারার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিলেন।গণনাট্যের সঙ্গে সংযোগ এই অনুভবকে আরো তীব্র করেছিল।বিশ্বের অঙ্গনে সোভিয়েত রাশিয়ার মতাদর্শের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির সঙ্গে তখন যুক্ত হয়েছে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান।সারা বিশ্বজুড়ে সাম্যবাদের অপ্রতিহত গতি আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকেও অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করছে।এর আগেই দেশ স্বাধীন হবার সাত মাসের মাথায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পার্টির নেতা-কর্মীদের ব্যাপকমাত্রায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।শাসকের শ্যেনদৃষ্টির থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীদেরও রেহাই নেই।সেই সময় মার্কসবাদী দর্শনে আকৃষ্ট উৎপলের মনোভঙ্গীর স্পষ্ট পরিচয় কলেজ পত্রিকাতেই প্রকাশিত -

"সময় এগিয়ে চলে, এমন কি শরৎচন্দ্রের যুগও অতিক্রান্ত হতে চলেছে।নতুন প্রজন্মের মৃত্যুর বিরুদ্ধে জেহাদ,তাদের কাব্যলক্ষ্মী হলেন শ,লরেন্স,জয়েস এবং হাক্সলি।ম্যাঞ্চেস্টার এবং স্তালিনগ্রাদ তাদের দুর্গ; ডাস ক্যাপিটাল তাদের নতুন বেদ।তাদের আনুগত্য তথ্যের প্রতি,আঙ্গিকের আতিশয্যের বিরুদ্ধে তাদের

চ্যালেঞ্জ।রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটছে সাহিত্যে, শ্রেণীসংগ্রামে এবং শোষিত বঞ্চিতের মহাক্ষুধায়।"

- লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই উৎপল দত্তের গোত্রান্তর ঘটে যায়।মার্ক্সবাদী জীবনবীক্ষায় তাঁর আস্থা দৃঢ়তর হতে থাকে।বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এই মানুষটি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ছত্রছায়ায় থিয়েটার করার পাশাপাশি নিজের দলের সৃজনী-বৃত্তেও অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন।কিন্তু 'জনতার মুখরিত সখ্য' থেকে আর দূরে থাকেননি কখনও।ইংরেজি পেশাদার থিয়েটারের কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে এ বার যুক্ত হল রাজনৈতিক থিয়েটার গড়ে তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।১৯৫৯ সালে তিনি পেশাদারি ভিত্তিতে মিনার্ভা রঙ্গালয় চালানোর দুরূহ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।সেই বছর মিনার্ভার মঞ্চে এল.টি.জি 'ওথেলো','ছায়ানট','অঙ্গার' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করে।এরপর ধারাবাহিকভাবে এই মঞ্চে অভিনীত হয় 'ফেরারী ফৌজ','তিতাস একটি নদীর নাম','কল্লোল','প্রফেসর মামলক','অজেয় ভিয়েতনাম' প্রভৃতি নাটক।সত্তরের উত্তাল দিনগুলিতে এসে নকশালপন্থী রাজনীতির আদর্শে লেখা নাটক 'তীর' উৎপলের সাংস্কৃতিক জীবনে সাময়িক অস্থিরতা তৈরী করে।বামপন্থার মূল ধারার সঙ্গে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর দলকে মিনার্ভা থিয়েটার ছাড়তে হয়।১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল,লেনিনের জন্মদিনে,মিনার্ভায় এল.টি.জি'র শেষ নাট্যাভিনয় - 'লেনিনের ডাক'।গ্রেফতার,কারাবাস ও রাজনৈতিক তৎপরতায় উৎপলের জীবন এই সময়-পর্বে বিক্ষুব্ধ, টালমাটাল।এরপর অক্লান্ত উৎপল গড়ে তোলেন নতুন নাট্যসংস্থা পিপলস লিটল থিয়েটার বা পি.এল.টি।পি.এল.টির হয়ে উৎপল একাধিক নাটক রচনা ও পরিচালনা করলেন - 'বর্গী এলো দেশে','টিনের তলোয়ার','সূর্যশিকার','ব্যারিকেড','টোটা','দুঃস্বপ্নের নগরী','লেনিন কোথায়','এবার রাজার পালা' প্রভৃতি নাটক।উৎপলের প্রযোজনা আবারও মানুষকে অভিভূত করে দেয়।'টিনের তলোয়ার' নাটকটিকে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় থিয়েটারের সর্বোচ্চ শিখর বলে বর্ণনা করেছেন।'কল্লোল' মঞ্চস্থ হবার পর,বিশেষত উৎপল নকশালবাড়ির সংগ্রামের সমর্থনে পশ্চিমবাংলার প্রান্তে-প্রত্যন্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার কারণে,বাজারি

সংবাদপত্রগুলি 'কল্লোলে'র বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দেয়।এমনকি সিপিআইএমের মুখপত্র 'দেশহিতৈষী'ও একসময় সে বিজ্ঞাপন ছাপেনি।এরপরে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমর্থনে লিখিত 'তীর' নাটকের মঞ্চায়নের পর,উৎপল দত্তকে বোম্বাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।দশদিনের মধ্যে মুচলেকার বিনিময়ে ছাড়া পান নাট্যকার।চলে যান রাজস্থানে - একটি আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংস্থার 'গুরু' চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে।এই ঘটনায় প্রবল বিতর্কের সূত্রপাত।অনেকে এই ঘটনাকে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বলে চিহ্নিত করেন।এল টি জি উৎপল এবং তাঁর স্ত্রী শোভাকে বহিষ্কার করে। কিছুকাল পরে উৎপল-অনুরাগীরা বোঝাবার চেষ্টা করেন এ ছিল তাঁর কৌশল।পরবর্তীকালে উৎপল তাঁর 'Towards a Revolutionary Theatre' গ্রন্থে এমন ধারণা গড়ে ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছেন।

এই সময়-পর্বটি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে নাট্যকারের স্ত্রী শোভা সেনের স্মৃতিচারণায় -

"বিয়ের পর উৎপলের সঙ্গে ইউরোপ ও সোবিয়েত ভ্রমণ থেকে ফেরার পর নতুন নাটক ধরা হল। অদ্বৈত মল্লবর্মণের বিখ্যাত উপন্যাস ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ নাট্যরূপ দিয়ে উৎপলের পরিচালনায় ১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ দোলপূর্ণিমার দিন মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হল। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে,এই নাটকে ‘নবান্ন’খ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অংশগ্রহণ করেছিলেন।উৎপলের সামরিক শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিক মহলা পদ্ধতির মধ্যে ওই অসুস্থ প্রবীণ অভিনেতা ধীরে ধীরে অভ্যস্থ হয়েছেন। রাতের পর রাত জেগে ওই সময়ে মহড়া চলত।পরিচালকের কোনও ক্লান্তি নেই।তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাদেরও ঘুম নেই। মালোপাড়ার ভাষা আর উচ্চারণ নীলিমা দাসের মতো অভিনেত্রী শিখেছিল বিজনদার কাছে।"

- ততদিনে উৎপলের বাসস্থান এস.আর.দাস রোডে নতুন পাড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে।ষাটের দশকে উৎপলের সৃজনী ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিল।সারা রাত্রি চলতো নাটকের মহড়া -

"উৎপল গোটা দিন মগ্ন থাকত নাট্য ও প্রবন্ধ রচনা বা অন্য সারস্বতচর্চায়।পাশাপাশি এরই মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীর মতো পথনাটক বা বক্তৃতা দিয়ে প্রচার সমাবেশের মধ্যমণি ছিল উৎপল। সন্ধ্যায় হতো নাটকের শো।উৎপলের এই নিরলস পরিশ্রম এবং দানবীয় কর্মকাণ্ডের রহস্য কী?এই সময়ে শরীরের স্বাভাবিক ক্লান্তি, অবসাদ এবং নিদ্রার অমোঘ প্রভাব কাটাতে উৎপল নিয়মিত স্নায়ু উত্তেজক, অত্যন্ত ক্ষতিকারক 'কোরিড্রেন' ওষুধ খেয়ে গেছে।আমি জানার পর এই আত্মবিনাশকারী ওষুধ খাওয়া বন্ধের চেষ্টা করেছি।হাতের কাছ থেকে ওষুধ সরিয়ে ফেলেছি।কিন্তু আমাকে লুকিয়ে দিনের পর দিন ওই ওষুধ খেয়ে উৎপল তার সৃজনক্ষমতা চাঙ্গা রেখেছে। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কৃত্রিম উপায়ে চিন্তাশক্তি ও লেখনীকে দ্রুতগতিসম্পন্ন ও সপ্রতিভ রাখতে গিয়ে উৎপলের শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।এই মারণ স্টেরয়েড ওষুধগুলি উৎপলের বিভিন্ন অত্যাবশ্যক অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের চিরস্থায়ী ক্ষতি করে দিয়েছিল যা তাঁর অকালমৃত্যুর অন্যতম কারণ।'তিতাস একটি নদীর নাম' উৎপলের জীবনের একটি সেরা পরিচালনার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিজন ভট্টাচার্যের মতো খ্যাতিমান, শক্তিশালী অভিনেতাও পরিচালক উৎপলের দাপটে পার্ট মুখস্থ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।আসলে বিজনদা ছিলেন আবেগাশ্রয়ী অভিনেতা,তাই চরিত্রে ডুবে গিয়ে পার্ট ভুলে যেতেন।কিন্তু উৎপলের মতে,অভিনেতার এত আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়, বৈজ্ঞানিক থিয়েটারে এটা চলে না। যাই হোক, 'তিতাস' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরির সুরে ও গানে, তাপস সেনের আলোর মায়ায়,মালোপাড়ার মাটির গন্ধমাখা জীবন-চিত্রণে, কৌম সংস্কৃতির পরিচয়ে এই নাটক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। 'তিতাস'-এর অন্য আকর্ষণ 'কালোবরণ' চরিত্রে উৎপলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অভিনয়।আমার অনুতাপ,আজকের থিয়েটারের ছাত্রছাত্রী বা দর্শক এগুলি দেখতে পেল না। কারণ, 'ফরিয়াদ' ছবির লম্পট, নির্মম হোটেলমালিক কিংবা 'অমানুষের' মহিম ঘোষাল অথবা 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ছবির মগনলালের থেকে কালোবরণ একেবারে আলাদা।কলকাতা পুরসভা 'তিতাস' নাটকে হলের মাঝখানে ক্যাট ওয়াকের জন্য র‍্যাম্প ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল।এর মধ্যে বিশ্ববরেণ্য

চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'তিতাস' দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন।উৎপলের প্রতিটি নাটক তিনি দারুণ আগ্রহভরে প্রথমেই দেখতেন।উৎপল নাট্যাঙ্গিক শিখেছিল মস্কোয় রুশ নাট্যনক্ষত্র অখলপকভের কাছে।শেষে সত্যজিৎবাবুর নির্দেশে কলকাতা পুরসভা এই নাটকের ছাড়পত্র দিতে বাধ্য হয়েছিল।বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এটা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।"

- ষাটের দশকের অস্থির, উত্তেজনাময় দিনগুলির চিত্রও এই স্মৃতিচারণায় ধরা পড়েছে।১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যে এই দেশের এক শ্রেণীর মানুষ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষে আক্রান্ত হয়েছিলেন।শাসক ও বহুলপ্রচারিত গণমাধ্যমের ক্রমাগত ইন্ধনে ১৯৬৪ সালে কলকাতার রাস্তায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।সংঘর্ষের লেলিহান শিখায় মধ্য কলকাতার কলাবাগান বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেল -

"....কাছেই বিডন স্ট্রিটে মিনার্ভা থিয়েটারে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়।কারণ, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।এর প্রতিবাদে উৎপল বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ফ্রিডরিশ ভোলফের 'প্রোফেসার মামলক' মূল জার্মান ভাষা থেকে অনুবাদ করে মঞ্চস্থ করেছিল।শাসকশ্রেণী কীভাবে জাতিদাঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, এই নাটকে তা দেখানো হয়েছিল।এই নাটকেই সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেত্রী রিনা (অপর্ণা সেন) এল.টি.জি- তে যোগ দিয়েছিল।রিনা ছিল আমার বহুদিনের পরিচিত।সে আমায় শোভামাসি বলে ডাকত। কিন্তু উৎপলকে রিনা রীতিমতো ভয় পেত সে সময়ে।বিশেষত থিয়েটারের প্রশিক্ষণ শিবিরে।রিনার সমস্ত সমস্যা, নালিশ আমায় জানাত। মহলার সময় আমিও অবশ্য উৎপলকে ভয় পেতাম।এই নাটকে প্রফেসার মামলকের চরিত্রে উৎপলের অবিস্মরণীয় অভিনয় আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল।১৯৬৫ সাল আমার জীবনের এক উথাল-পাথাল পর্ব।আমার জীবন মানে তো উৎপলকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত।সে বছর মার্চে মিনার্ভায় মঞ্চস্থ হয়েছিল উৎপল রচিত ও পরচালিত 'কল্লোল' নাটক। ১৯৪৬

সালের ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ জাহাজ ‘খাইবার’এর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে উৎপলের এই নাটক অবশ্যই আমাদের থিয়েটারের ইতিহাসে একটি ক্রোশফলক।"

- আশির দশকের শেষ দিক থেকেই উৎপল অসুস্থ হয়ে পড়েন।বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী এই নাট্যব্যক্তিত্বের সৃষ্টিশীল জীবনের অবসান ঘটে ১৯৯৩ সালের ১৯শে আগস্ট।তিনি ছিলেন সব ধরনের অভিনয়ে স্বচ্ছন্দবিহারী।সিরিয়াস রোলে দুর্দান্ত অভিনয়ের সঙ্গেই মজাদার বা কমিক রোলেও অসামান্য অভিনয় করতেন।'ভুবন সোম'-এ তাঁর চরিত্রাভিনয় বা 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এ তাঁর কৌতুকাভিনয় অথবা 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ মগনলাল মেঘরাজ – এ কি ভোলা যায়।উৎপল দত্ত অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র – বিদ্যাসাগর (১৯৫০), মাইকেল মধুসূদন (১৯৫০), চৌরঙ্গী (১৯৬৮), ভুবন সোম (১৯৬৯), গুড্ডি (১৯৭১), ক্যালকাটা ৭১ (১৯৭১), শ্রীমান পৃথ্বীরাজ (১৯৭৩), ঠগিনী (১৯৭৪), যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো (১৯৭৪), কোরাস (১৯৭৪), পালংক (১৯৭৫), অমানুষ (১৯৭৫), জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৮), গোলমাল (১৯৭৯), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), আঙ্গুর (১৯৮২), পার (১৯৮৪), পথভোলা (১৯৮৬), আজ কা রবিনহুড (১৯৮৭), আগন্তুক (১৯৯১), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩) ইত্যাদি।

১১.৩ উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি

উৎপল দত্তের আবির্ভাব এক সংক্ষুব্ধ সময়ের বুকে।সমগ্র বিশ্ব,বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে তখন আগামীর যাবতীয় সঙ্কল্প ও সম্ভাবনা অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত হয়েছে।বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটতে থাকে।তারই সাথে বদলে যেতে থাকলো সমাজ,অর্থনীতি,আমাদের পরিচিত ভূগোল,সামাজিক মূল্যবোধের প্যাটার্ন,মানুষের বিশ্বাস এবং তৎসম্পর্কিত বাহ্যিক আচার-আচরণ যা চল্লিশের দশকে গিয়ে আমাদের দেশে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করল।উৎপল দত্ত এই সময়কালেই বেড়ে উঠেছেন।সময়ের দাক্ষিণ্যেই তিনি বিশ্বজুড়ে জীবনের অসংখ্য শাখা-প্রশাখাময় বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।বিচিত্র যুগপ্রভাব তাঁকে

রাজনৈতিক উত্থান-পতন সম্পর্কে সচেতন করেছিল।উৎপল দত্তের নাটকগুলি তাঁর রাজনীতিবোধ এবং নিরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকলো।বলা বাহুল্য যে ততদিনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের আঁচ থিয়েটারে এসে পড়েছে।বাংলা নাটক এবং থিয়েটার তার জন্মলগ্ন থেকেই সমাজ সমস্যাকে নিজের আঙ্গিকে স্থান দিয়েছে,একইভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতি শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের নগ্ন স্বরূপ।সেই কারণেই ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা থিয়েটারের স্বাধীন গতিবিধিকে খর্ব করতে চেয়েছে।সাময়িকভাবে তা বাংলা নাটকে প্রভাব ফেললেও,বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই চিত্রটা বদলে যেতে থাকে।এরপর বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা,জাতীয় মুক্তি আন্দোলন,ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপন,গণনাট্যের উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে বাংলা থিয়েটারের সাথে মতাদর্শের যোগাযোগ আরো প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।এমনকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির অত্যন্ত নিকটবর্তী সময়ে সেকালের সবচেয়ে সুকুমার নাট্যকলাবিদ শিশিরকুমার ভাদুড়ির বক্তব্যেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে।এই সময়েই উৎপল দত্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে থিয়েটার ও অভিনয়শিল্পকেই নির্বাচিত করেছিলেন।মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাস,বামপন্থী চিন্তাধারা তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।অভিনেতা,প্রযোজক,পরিচালক,নাট্যকার, নাট্যান্দোলন কর্মী - যখন যেমন প্রয়োজন পড়েছে,তখনই সেই রূপে আবির্ভূত হয়েছেন উৎপল দত্ত।এই সবকটি ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভার বিরাটত্বের সাক্ষ্য পেশ করেছেন।তবে নাট্যকার হিসেবে সকল প্রতিভাকে তিনি অতিক্রম করে যান।এই সংগ্রামী শিল্পীর অক্ষয় তূণীরের শ্রেষ্ঠ আয়ূধ তাঁর নাটক।থিয়েটারের মধ্যে দিয়েই তিনি মানুষের খুব কাছে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন,তাঁকে চিনতে শিখেছেন।আবার এর সাহায্যেই তিনি মানুষকে অধিকার সচেতন করে তাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথের দিশা দেখিয়েছেন।এখানেই তাঁর নাটকের বিশেষত্ব।

উৎপল দত্তের কাছে মানুষ সংক্রান্ত চেতনা শ্রেণিসমাজের বাস্তব চেতনাকেই বহন করে।সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে গভীর বীক্ষা তাঁর নাটকগুলিতে প্রতিফলিত

হয়েছে।তিনি বাংলার নবজাগরণের নবতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন।উনিশ শতকের বঙ্গীয় সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে মধুসূদনের বিদ্রোহের যথার্থ মূল্যায়ন তাঁর মন্তব্যেই প্রকাশিত হয়েছে।নাটক তাঁর কাছে নিছক অবসর-বিনোদনের মাধ্যম নয়,তা অস্ত্র এবং এই নাট্যকারের মুন্সীয়ানায় 'টিনের তলোয়ার'ও শ্রেণীশাসিত সমাজে আলোড়ন তৈরী করে।উৎপল দত্তের রাজনৈতিক নাটকগুলি শ্রেণী ও ইতিহাস চেতনার অমোঘ সত্যকে ধারণ করেছে।'রাতের অতিথি','ছায়ানট','সূর্যশিকার','মানুষের অধিকার' প্রভৃতি নাটকে অনিবার্যভাবে সেই শ্রেণী-সচেতনতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে।আবার 'টোটা,'লাল দুর্গ','তিতুমীর','কল্লোল','দিল্লী চলো', 'ক্রুশবিদ্ধ কুবা' প্রভৃতি নাটকে ইতিহাসের নবমূল্যায়ন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এক নতুন দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে।

নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে ভারতবর্ষের সমাজ,রাজনীতির পাশাপাশি বিশ্বরাজনীতির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই,পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন।ভারতীয় উপমহাদেশের সংগ্রামী জনতার পরিচয় তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রতিটি পদক্ষেপেই স্পষ্ট।সেই অনমনীয় সংগ্রামমুখর মানুষ কীভাবে ত্রাস ও নিপীড়নকে তুচ্ছ করে তাদের কাঙ্ক্ষিত অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে তার চিত্রাঙ্কন আমরা উৎপল দত্তের নাটকে লক্ষ্য করি।জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গণ-বিপ্লবের কাহিনী তাঁর রচনার চমৎকারিত্বে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়কালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম,১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ,সন্ন্যাসী বিদ্রোহ,ওয়াহাবি আন্দোলন,জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত অধ্যায়,আজাদ হিন্দ ফৌজের দুঃসাহসিক অধ্যায়,নৌবিদ্রোহ, দেশবিভাগের মর্মন্তুদ ঘটনার মতো নানান ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের ওপর তিনি ডায়ালেকটিক্সের আলোকপাত ঘটিয়েছেন।পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠনের যে ঘটনা আজও সর্বহারা শ্রেণীর চোখের মণি সেই প্যারি কমিউনের স্থাপনা,অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বের ও পরের সময়পর্ব,ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রাম,মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব,ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ,কিউবা বা ইন্দোনেশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সাম্যবাদী

আন্দোলন,বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়সহ বিশ্ব রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় ঘটনাতাঁর নাটকের বিষয়বস্তু।

নিজেকে 'প্রোপাগান্ডিস্ট' বললেও,তাঁর নাটকগুলি নিছক প্রচারমূলক কিংবা শ্লোগানধর্মী হয়ে ওঠেনি।তাঁর নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ভিত কাঁপিয়ে দিতে চেয়েছে।নাটকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিরুদ্ধতা গড়ে তোলা এবং তারই ধারাবাহিকতায় সংগঠিত গণ-আন্দোলনের পথে মানুষের ক্রোধ ও বিক্ষোভের অনিবার্য আত্মপ্রকাশ তিনি আজীবন কামনা করেছেন।উৎপল দত্ত তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনে এই ব্রতকেই শিরোধার্য করেছিলেন।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে উৎপল দত্ত উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাঙালীর রঙ্গালয়ের ভূমিকাকে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন।নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনকে ভিত্তি করে ব্রিটিশ শাসক বাঙালীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকেই খর্ব করতে চেয়েছিল।এই পথেই ইংরেজদের সাহায্যে হঠাৎ করে বড়লোক হওয়া মুৎসুদ্দিরা থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতার আড়ালে তাদের অনৈতিক ব্যাভিচার এবং বেলেল্লাপনাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।শিল্পীদের তারা দাসানুদাস মনে করতেন।রঙ্গমঞ্চ স্রেফ তাদের মুনাফার ক্ষেত্র।তার জন্য যে কোন স্তর পর্যন্ত নামতে তারা রাজী ছিলেন।বাঙালী মধ্যবিত্তের মেধা এবং স্বপ্নকে পদদলিত করে,সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বাধীন নাট্য প্রযোজনার পর বিদেশী শাসকের প্রয়োজনেই থিয়েটারের ওপরে নেমে এলো নিষেধাজ্ঞার আঘাত।সেই যুগপ্রেক্ষিতের অসামান্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত তাঁর নাটকটিতে বিদেশীদের শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্পীদের প্রতিবাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতচারণায় ফিরে গিয়েছেন,পরম আন্তরিকতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন বাঙালীর রঙ্গালয়ের আদি পুরুষদের,মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন একটি যুগের জীবন্ত ভাষ্য।

১১.৪ অনুশীলনী

মন্তব্য

১. উৎপল দত্ত কোন সময়ের প্রতিনিধি?একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার হিসেবে তাঁর সার্থকতা বিচার কর।

২. উৎপল দত্তের নাটকে রাজনীতি বা মতাদর্শ কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা তাঁর কয়েকটি নাটকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

৩. উৎপল দত্তের নাট্যরচনার বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।

৪. উৎপল দত্তের নাটকে মধ্যবিত্ত চেতনার রূপান্তর সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

১১.৫ গ্রন্থঋণ

১. টিনের তলোয়ার - উৎপল দত্ত

২. থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত - দর্শন চৌধুরী

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ

৪. উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা - পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

৫. উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার - জগন্নাথ ঘোষ

৬. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৭. বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর - নৃপেন্দ্র সাহা

৮. প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি : উৎপল দত্ত - আবদুল্লাহ আল মোহন

৯. ইন্টারনেট

একক ১২ – 'টিনের তলোয়ার' – প্রেক্ষাপট, চরিত্র বিচার

বিন্যাস ক্রম

১২.১ প্রস্তাবনা

১২.২ ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

১৩.৩ বিষয়বস্তুর নিরিখে চরিত্রবিচার

১২.৪ অনুশীলনী

১২.৫ গ্রন্থঋণ

১২.১ প্রস্তাবনা

'টিনের তলোয়ার' উৎপল দত্তের একটি কালোত্তীর্ণ রচনা।উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তব চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।বাঙালীর রঙ্গালয়ে যখন নাটকের মাধ্যমে সরকার বিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, তখন শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার Dramatic Performances Act আইনের দ্বারা বাঙালীর স্বাধীন মতপ্রকাশের প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন।অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের পটভূমিকায়,বাংলা থিয়েটারের ফেলে আসা ইতিহাসের ওপর নাট্যকার তাঁর 'টিনের তলোয়ার' নাটকে সন্ধানী আলোকপাত করেছেন।

১২.২ ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট

বাঙালীর রঙ্গালয়ের ইতিহাস অনুযায়ী আমরা এবিষয়ে অবগত হয়েছি যে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই বাংলা নাটকাভিনয় একটি নতুনতর

যুগে পদার্পণ করলো।আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই সময় মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসলোকে জাতীয় ভাবনার স্ফূরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।যে বাঙালি এতদিন মূক,নির্লিপ্ত হয়ে সমস্ত অবিচার মেনে নিয়েছে,তারা এবারে নিজেদের পরিস্থিতির প্রতি সচেতন দৃষ্টিপাতের আবশ্যকতা অনুভব করেছে।ফলে সমস্ত কিছুর সাথে সাথেই তার নন্দনচিন্তাতেও এসেছে পরিবর্তন,বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির বদলে সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার ফুটে উঠছে।

বাংলা রঙ্গালয়ের এটি একটি বিশেষ পর্ব,কেননা বাঙালির মানস পরিবর্তনের সমস্ত সাক্ষ্য সে বহন করছে।এই সময়ে নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,শিশির কুমার ঘোষ,লক্ষীনারায়ন চক্রবর্তী,হরলাল রায়,নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,প্রমথনাথ মিত্র,উমেশচন্দ্র গুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখেরা।এঁদের নাটকে স্বদেশাত্মক ভাবধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।এমনকি সামাজিক অনাচার - অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত করার সময় মানুষ রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতেও আর ভয় পাচ্ছে না।বাংলা নাটকের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেই নির্ভীক বিরুদ্ধতার ভাব যদি বৃহত্তর গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে,তবে নিজের শাসনতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।ফলে নিজেদের স্বার্থেই সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত ব্রিটিশের আশু প্রয়োজন।তাই স্রেফ নাটকাভিনয়ের দ্বারা সনাতন এবং পিউরিটান মনে আঘাত করার অভিযোগে ১৮৭৬ সালে Dramatic Performances Act বা অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অবতারণা হলেও এর পিছনে ইংরেজ শাসকের আরো বৃহত্তর অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল।

শুধুমাত্র অর্থাভাবের কারণেই একসময় নবজাগ্রত বাঙালিকে শখের নাট্যশালায় বিত্তবান মালিকের খামখেয়ালিপনা মেনে নিতে হয়েছে।তাদের অনুমতি ব্যতীত কোন নাটক সেই সময়ে বাংলার নাট্যমঞ্চে অভিনীত হতে পারেনি।ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা জাতীয়তার ভাবনায় উদ্দীপ্ত বাঙালিকে এই অধীনতা থেকে মুক্তি দিল,তার

নিজস্ব থিয়েটারে সে স্বচ্ছন্দভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারল।ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকটি হল দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত সৃষ্টি 'নীলদর্পণ'।নাটকটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই ব্রিটিশ শাসকদের রোষদৃষ্টির মুখে পড়ে।ব্রিটিশ সরকার এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে মামলা করে এবং ১৮৬১ সালে পাদ্রী জেমস লং নাটকটির প্রকাশক হিসেবে এক মাসের জেল ও এক হাজার টাকা জরিমানার শাস্তির কবলে পড়েন। যদিও সেই সময়ের অনেক বিশিষ্ট মানুষ এই শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং নানাভাবে নাটকটিকে আইনি সহায়তা প্রদানে তৎপর হয়েছিলেন।শাসকের পক্ষ থেকে 'নীলদর্পণ' নাটকের কিছু অংশকে সরাসরি মানহানিকর বলে সাব্যস্ত করা হয়।আসলে থিয়েটারের প্রতি অনুরক্ত ইংরেজরা এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে সভা-সমিতি,আবেদন-নিবেদনের পাশাপাশি অভিনয়ের মাধ্যমে জাতীয় ভাবনা এবং ইংরেজ বিরোধিতাকে অনেক বেশি পরিমাণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।এতদিন পর্যন্ত তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল কারণ শখের নাট্যশালায় এমন কোন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি যা ঘোষিতভাবে সমাজপতি কিংবা শাসকের বিরুদ্ধে কথা বলে।কিন্তু ১৮৭২ সালে একদিকে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ,অন্যদিকে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে স্বদেশ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও সুচিন্তিত মতামতগুলি অনেক বেশি পরিমাণে সংহত হওয়ার অবকাশ পেল।

ন্যাশনাল থিয়েটারের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজদের নানান মহল থেকে তীব্র আপত্তি জানানো হয়।দরিদ্র বাঙালির ওপর নীলকর সাহেবের অমানবিক অত্যাচার,কৃষকের সাহেবকে আক্রমণের ঘটনা যখন মঞ্চে অভিনীত হলো তখন তা ব্রিটিশদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।এই নাটকাভিনয় তো শুধু প্রকাশ্য মঞ্চে নীলকর সাহেবের অত্যাচারকেই দর্শক-জনতার কাছে উন্মোচিত করেনি,তা আরো অনেক মানুষকে শাসক,অত্যাচারীর সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।এর ফলশ্রুতি হিসেবেই একাধিক দর্পণ নাটকের জন্ম হতে থাকে।এমনই একটি নাটক ছিল দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ'।নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫

খ্রিস্টাব্দে।অভিনয় সম্ভব হয়নি কারণ তার আগেই ব্রিটিশ সরকার এই বইয়ের বিষয়-বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।'চা-কর দর্পণ' নাটকে যে চা-ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের নগ্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছিল তারা জাতিতে ছিলেন ইংরেজ।এই নাটকে ব্রিটিশবিরোধিতার সুর স্পষ্ট।ফলে নাটকটি জনসমক্ষে অভিনীত হলে সেটা যে ব্রিটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপর প্রচন্ড আঘাত হবে তা বুঝে নিতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি।অভিজাত ব্রিটিশ চা-ব্যবসায়ীদের রক্ষা করা শাসকের আশু প্রয়োজন ছিল।পরবর্তীকালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের যে খসড়াটি ল'মেম্বর মি.হবহাউস সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন তার প্রতিটি ছত্রে বাংলা নাটক ও মঞ্চের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের সাক্ষ্য হিসেবে 'চা-কর দর্পণ'সহ একাধিক নাটকের উল্লেখ ছিল।

১৮৭২-১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে অভিনীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম',কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতে যবন',হরলাল রায়ের 'বঙ্গের সুখাবসান','হেমলতা', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গুইকোয়ার',অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ',উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎসরোজিনী','সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রভৃতি নাটকগুলিতে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কিংবা সাম্প্রতিক বিষয়কে অবলম্বন করে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতার নিদর্শন রয়েছে।ফলে এইজাতীয় অভিনয় বন্ধের জন্য সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিল।এই চেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারতো দুইভাবে,আইনের বলে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারা।পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার,হুমকি এবং ভয় দেখিয়ে করে যখন কোনোভাবেই এই ধরনের নাটকের অভিনয় বন্ধ করা গেল না তখন তাদেরকে আইনের কথা ভাবতে হয়েছে।এই উদ্যোগে তারা পাশে পেয়েছে তৎকালীন বাঙালির একটি বৃহত্তর অংশকে।বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলা রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে নীতিবাগিশ বাঙালী অশ্লীলতা এবং নোংরামির রব তোলে।এঁদের উদ্যোগেই ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে Society for the Suppression of Public Obscenity গঠিত হয়।এখানে সমাজের পিউরিটান মনোভাবপন্ন অংশ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন।বক্তা

ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন,কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়,হিন্দু সমাজের মুখ হিসেবে কালীকৃষ্ণ দেব প্রমুখেরা।সামাজিক সংস্কার এবং সমস্ত প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা সেই সময় বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত হচ্ছিল তাকে এই সংগঠনের সদস্যরা সমর্থন করেননি।এই বিরোধিতার সর্বাগ্রে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যবৃন্দ।অনেকের মতে তাঁদের বিরোধিতার পিছনে নৈতিক উদ্দেশ্যের সাথেই রাজনৈতিক কারণও ছিল।ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে জাতীয় সংস্কৃতির কথা সর্বদা আলোচিত হলেও পেশাদারি রঙ্গালয়ে রাজশক্তি এবং তার সহযোগীদের সমালোচনা তাঁদেরকে বিচলিত করেছিল।তাই থিয়েটারের ওপর যখন শাসকের সংগঠিত আক্রমণ নেমে এল,তখন তাঁরা উদাসীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন।

তাছাড়াও সেই সময়ের অধিকাংশ নাটকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইংরেজের লেজুরবৃত্তি করা কিছু বাঙালি অভিজাত।তাদের ভণ্ডামী এবং কেচ্ছার অনেক সংবাদ সেই সময়ের প্রহসনগুলিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল।রাজকর্মচারী,বাঙালী বাবু,ধর্মধ্বজী ভণ্ড,লম্পট ও অত্যাচারী জমিদার সকলের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে নাট্যকারেরা সংকোচ বোধ করতেন না।ফলে রঙ্গালয়ের অভিনয় এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ মানুষের চক্ষুশূল হয়।তারা নাট্যনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারকে সম্মিলিত সমর্থন জোগাতে থাকেন।এই প্রেক্ষাপটেই ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অবতারণা হয়,যার উপলক্ষ্য হিসেবে সরকার কয়েকটি নাটকের অভিনয়কে চিহ্নিত করেন।

এই সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র প্রিন্স অফ ওয়েলসের কলকাতায় আগমনকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।তার একান্ত ইচ্ছা অভিজাত বাঙালি ভদ্রঘরের কুলবধূদের তিনি দেখবেন।বাংলাদেশের হিন্দুর কাছে সেই সময় এটি একটি মারাত্মক প্রস্তাব।যদিও সেই সময় ইংরেজের স্নেহধন্য রাজভক্ত প্রজার অভাব ছিল না।ফলে যুবরাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এগিয়ে এলেন হাইকোর্টের উকিল এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়।তার ভবানীপুরের বাড়ির অন্দরমহলের নারীরা যুবরাজকে বরণ করলেন।এই ঘটনা তৎকালীন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি

করে।একদিকে হিন্দুধর্মের সংস্কার এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে আঘাত করার ফলে রক্ষণশীল এবং শিক্ষিত বাঙালি কেউই এই ঘটনাকে মেনে নিতে পারেননি।ফলে সমাজের নানা মহলে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় ওঠে।বাংলা রঙ্গালয়ও তার থেকে দূরে থাকতে পারেনি।উপেন্দ্রনাথ দাস যাঁর নাটকে সেসময় জাতীয়তাবাদের সবথেকে তীব্র প্রকাশ ঘটেছিল,তিনি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকটি রচনা করলেন।১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই নাটকটি মঞ্চে অভিনীত হয়।

জগদানন্দ যে এই নাটকে গজদানন্দে পর্যবসিত হয়েছেন সে কথা বলা বাহুল্য।প্রিন্স অফ ওয়েলস হয়েছেন দিল্লীর অধিপতি হোরাঙ্গজীবের পুত্র।নাটকে ব্যবহৃত গানগুলির রচনাকর্তা ছিলেন গিরিশচন্দ্র।

'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটকটি সেই মাসের ২৩ তারিখ পুনরাভিনীত হয়।এই প্রথম ব্রিটিশ সরকার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং গজদানন্দ নাটকে রাজভক্ত সম্ভ্রান্ত প্রজাকে বিদ্রুপ করা হয়েছে এই অভিযোগে অভিনয় বন্ধ করে দেয়।গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নাটকের মূল বিষয়কে একই রেখে কেবলমাত্র নাম পরিবর্তন করে আরো একবার অভিনয়ের আয়োজন করেন।কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ সুপার মি.ল্যাম্ব এবং পুলিশ কমিশনার মি.স্টুয়ার্ট হগকে ব্যঙ্গ করে 'পুলিশ অফ পীগ এন্ড শীপ' নাটকটি অভিনীত হয়(এই প্রসঙ্গেই লটিনের তলোয়ার' নাটকে ইংরেজ অফিসারের 'ল্যাম্বার্ট' নাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে) উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের সাথে।'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকে নায়ক সুরেন্দ্র ও লম্পট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের পারস্পরিক সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে।সুরেন্দ্রের বোন বিরাজমোহিনীর ওপর সাহেবের জঘন্য অত্যাচারের প্রচেষ্টা এবং তার সাহেবকে পদাঘাতের দৃশ্য দর্শকপূর্ণ প্রেক্ষালয়ে অভিনীত হয়েছে।উপেন্দ্রনাথের 'শরৎসরোজিনী' নাটকের বিষয় ছিল আরো বেশী উত্তেজনাপূর্ণ।সেখানে মতিলাল নামক একজন দুশ্চরিত্রের ভোগবাসনাকে তৃপ্ত করার ক্ষেত্রে সে গোরাদের সঙ্গ পেয়েছে।এই নাটকে

শরৎ মঞ্চের ওপরেই একজন গোরাকে গুলি করে মেরেছে।তার জন্য অনুতাপের বদলে সে সচেতনভাবে দোষ স্বীকার করেছে এবং বলেছে উৎপীড়িত স্বদেশবাসীকে ইংরেজের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সে প্রাণবিসর্জন দিতেও প্রস্তুত।'শরৎসরোজিনী' নাটকে সরোজিনীর হাতেও অনুরূপ একটি গোরার হত্যার দৃশ্য রয়েছে।

সুতরাং ইংরেজ শাসকের কাছে এই ধরণের ঘটনাক্রম সমন্বিত নাটকের প্রকাশ্য অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ব্যাপার।তারা তাদের রাজ্যভোগকে দীর্ঘায়িত করার জন্য যে কোন প্রতিবাদের প্রচেষ্টাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন।ফলে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী লর্ড নর্থব্রুক একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন।এই অর্ডিন্যান্সের বলেই ৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনালে 'সতী কি কলঙ্কিনী' এবং 'উভয়সঙ্কট' নাটকদুটি অভিনয়ের সময় পুলিশ রঙ্গালয় ঘিরে ফেলে এবং রঙ্গালয়ের অন্যতম ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস,ম্যানেজার অমৃতলাল বসু,অভিনেতা মতিলাল সুর,অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল বসু,শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,গোপাল দাস এবং সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যালকে গ্রেফতার করে।রঙ্গালয়েরর মালিক ভুবনমোহন নিয়োগীকেও আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়।বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস এবং অমৃতলাল বসু দুজনেরই এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

রঙ্গালয়ের উপর নেমে আসা এই আঘাতে সেই সময়ের অনেক বিশিষ্ট মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন।কিন্তু তাতেও ইংরেজ সরকার ক্ষান্ত হননি।১৮৭৬-এর ১৫ই মার্চ তারিখে মি.হবহাউসের Dramatic Performances Control Bill আইনের খসড়াটি সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করেন।অবশেষে ১৮৭৬-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিলটি আইনে পরিণত হয়।রঙ্গমঞ্চে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ওপর আঘাত রূপে এই আইন প্রথমে কলকাতায়,পরবর্তীতে দেশের সর্বত্র কার্যকরী হয়।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে ইংরেজ শাসক বাঙালির রঙ্গালয়ে যে কোন নাটকের বিচারকর্তা হয়ে ওঠে।কোন নাটকের কতখানি অভিনয়যোগ্য,কোন অংশটির অভিনয়

করা যাবে না,কোন সংলাপ বাদ দিতে হবে - সেই সমস্ত কিছু ভিডিও আইন এবং পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।এই আইনে যে কোন বাংলা পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয় এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী,মঞ্চাধ্যক্ষ্য,ম্যানেজার,থিয়েটার মালিক অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই অভিযুক্ত ও শাস্তিযোগ্যের আওতায় এনে ফেলা হয়।আইনের বিধি লঙ্ঘিত হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার,জরিমানা এমনকি জেলের ব্যবস্থার সাথেই রঙ্গালয়ের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাও পুলিশকে দেওয়া হয়।এমনকি আইনের ৬নং ধারা অনুযায়ী বিধিবহির্ভূত নাটকের দর্শকও অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন এবং পরিণামে তার কারাবাস ও জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই আইনের অবতারণার ফলে রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।নাট্যকার হিসেবে উপেন্দ্রনাথ দাসের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট হয় এবং তিনি ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দেই বিলেত চলে যান।গ্রেট ন্যাশনালের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী সর্বস্ব হারিয়ে থিয়েটারের সঙ্গে সমস্তরকমের সংস্রব ত্যাগ করেন।অমৃতলাল আন্দামানে চলে যেতে বাধ্য হন।অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আরো অনেকের স্বর স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বাংলায় ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থানের পথ প্রশস্ত হয়।

অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের ফলে নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বাধীন চিন্তাধারার প্রকাশ বহুলাংশে ব্যাহত হয়।এরপর প্রায় দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে বাঙালীর থিয়েটারে স্বদেশভাবাপন্ন নাটকের অভিনয় সম্ভব হয়নি।রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে বাংলা রঙ্গমঞ্চ তখন সামাজিক,পৌরাণিক ভক্তিমূলক,গীতিনাট্য,প্রহসন ইত্যাদির অভিনয় চর্চায় মনোনিবেশ করেছে।সমাজ সংস্কার ও যুক্তিবাদের বদলে এই পর্বের নাটকে সনাতন ধর্ম এবং ভক্তিবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে।অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বিংশ শতকের প্রথমেই,বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।ডিএল রায়,ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারের নাটকে সেই জাগরণের ইঙ্গিত প্রকাশিত হতে লাগলো।রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এইসময় পথে

নেমেছিলেন।তবে এত কিছুর পরেও স্বীকার করতেই হয় যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক বিকাশের পথকে রুদ্ধ করেছিল।এই আইনের ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট','আর্মস অ্যাক্টে'র মত আইন কার্যকর করে।প্রথমটির দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং দ্বিতীয়টির বলে ভারতীয়দের নিরস্ত্রীকরণ সম্পন্ন হয়।এই সমস্ত দমনমূলক আইনের ক্ষেত্রেই পথ প্রদর্শক ছিল 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'।

উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের পটভূমিকা হিসেবে উনিশ শতকের এই অস্থির সময়কেই বেছে নিয়েছেন।তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার অগ্রণী উদ্যোগীদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।তবে সেই উদ্দেশ্য সাধন ব্যতিরেকেও আলোচ্য নাটকে উনিশ শতকের একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের আধুনিক Narrative রচনা করা হয়েছে,যেখানে বাংলা রঙ্গালয় এবং সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন নাট্যকার।দ্বন্দ্বতত্ত্বের আলোকে এখানে বিভিন্ন চরিত্রগুলির শ্রেণী-অবস্থান আলোচিত হয়েছে।ইতিহাসের সচেতন অনুসরণ চরিত্রগুলিকে ক্লাসিকের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে।বিশেষত বেণিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি।এই নাটক ১৯৭১ সালে রচিত হয়।সত্তরের দশক বাঙালীর রাজনৈতিক সংগ্রামর নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ।নকশাল আন্দোলন সেই সময়ে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।উৎপল স্বয়ং এই আন্দোলনের সমর্থনে বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্তে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার কারণে একসময়ের সহযোদ্ধাদের বিরাগভাজন হয়েছেন।তবু নকশাল আন্দোলনকে স্মরণে রেখেই রচনা করেছেন 'তীর' নাটক।মনে রাখতে হবে যে এর পূর্বে ১৯৬৫ সালে 'কল্লোল' নাটকটির জন্য উৎপল গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।স্বাধীন দেশের সরকার ব্রিটিশদের অনুসরণেই বাংলা নাটকের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিল যা মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী নাট্যকারের পক্ষে কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।তাই নাটকের প্রেক্ষিত হিসেবে তিনি বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন।কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন,কৃষক আন্দোলন,ফ্যাসিস্ট শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের আত্মবলিদান,বিচ্যুতি এবং ক্রমাগত পথসন্ধানের উত্তাল

রাজনৈতিক পরিসরে দাঁড়িয়ে বাংলা থিয়েটারের গৌরবময় ঐতিহ্য যে গণমানুষকে সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে,তা 'টিনের তলোয়ার' নাটকের মাধ্যমে উৎপল দত্ত তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নাটকের চরিত্র পরিকল্পনা,ঘটনার বিন্যাস,নাট্যোৎকণ্ঠা সৃষ্টির প্রতিটি পদক্ষেপেই ফেলে আসা সময়ের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি রয়েছে।এই চিত্র এতটাই জীবন্ত যে নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে পাঠক-দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেন।প্রিয়নাথের চরিত্র ইয়ং বেঙ্গলের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মধুসূদনের থেকেও পরবর্তীকালে তাঁর ভাবশিষ্য উপেন্দ্রনাথ দাসের কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ করায়।বেণিমাধবের চরিত্রে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের আশ্চর্য প্রতিফলন আমরা অনুভব করি।তাছাড়া গ্রেট ন্যাশনালের প্রযোজনা,অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন,'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাটক,অমৃতলালের কারাবাসসহ একাধিক বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ এখানে লক্ষ্য করা যায়।এই নাটক একাধারে নাট্যকারের সুতীক্ষ্ণ কালচেতনার স্মারক।অন্যদিকে ব্রিটিশের তৈরী কালা কানুনকে অগ্রাহ্য করে শাসকের বিরুদ্ধে বাংলা রঙ্গালয়ের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের বিদ্রোহই বর্তমানের সঙ্গে নাট্যকাহিনীর সংযোগ সূত্র নির্মাণ করেছে।

১২.৩ বিষয়বস্তুর নিরিখে চরিত্র বিচার

নাটকের শুরুতেই বেণিমাধবের উপস্থিতিতে নটবরকে তাদের দলের আগামী প্রযোজনা 'ময়ূরবাহন নাটক'-এর পোস্টার টাঙাতে দেখা যায়।এখানেই আমরা বেণিমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবুর প্রাথমিক পরিচয় লাভ করি।তিনি একজন জাত থিয়েটারওয়ালা।ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকা তাকে 'বাংলার গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেছে।বাঙালীর রঙ্গালয়ে বাংলা নাটকের অভিনয় তখন রমরমিয়ে চলছে।অথচ সেই নাট্যাভিনয়ের সাথে সমাজের সাধারণ,প্রান্তিক মানুষের যোগাযোগ ঠিক কতটা তা মেথরের সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে।যুগপ্রয়োজনকে অনুভব করলেও বাঙালীর রঙ্গালয় তখন অনেক কিছুই প্রকাশ্যে বলতে পারছেনা।ব্যবসায়িক থিয়েটারের

উত্থানে বাংলার রঙ্গালয়গুলি ধনী মুৎসুদ্দির রুচির বিরুদ্ধে যেতে পারছেনা।অতিরিক্ত মাত্রায় দর্শক আকর্ষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত মুনাফালোভী মুৎসুদ্দিদের নিয়ন্ত্রণে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে একের পর এক সস্তা নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে।বীরকৃষ্ণ দাঁ তেমনই একজন মুৎসুদ্দী ধনপতি।তার কাছে নাট্যশিল্প এবং মঞ্চের পণ্যমূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য নেই।এই বীরকৃষ্ণদের মত একশ্রেণীর মানুষ একদিকে ইংরেজদের স্বার্থ অটুট রাখত, অন্যদিকে মেকি আভিজাত্যবোধে আর টাকার গরিমায় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে মাতব্বরি করত।

কাপ্তেনবাবু বেণিমাধব চট্টোপাধ্যায় এই নাটকের সর্বপ্রধান চরিত্র।তার চরিত্রটি সেই যুগের একাধিক নাট্যব্যক্তিত্বের প্রেরণায় গড়ে তোলা হয়েছে।বেণিমাধব সর্বাংশে একজন শিল্পী - অভিনেতা এবং নির্দেশক।শিল্পী হিসেবে স্বাধীনতার সর্বোচ্চ সুবিধা তিনি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে লাভ করতে কুণ্ঠিত নন।অথচ শুধুমাত্র নাটক করতে পারার উপায় হিসেবেই তার মত মানুষকে বীরকৃষ্ণের মত কদর্য,নারীমাংসলোভী মুৎসুদ্দির সাথে আপোস করতে হয়।এই অধীনতার বিনিময়েই তার থিয়েটার টিকে থাকে।তাই মেথরের মন্তব্য তার বুকে 'খরসান তরবারিসম' আঘাত করলেও তিনি কোন প্রত্যুত্তর জোগাতে পারেন না।আসলে মেথর যখন বেণির থিয়েটারি অভিনয়কে 'টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী' বলে বর্ণনা করে,তখন বেণি স্বয়ং এই উচ্চারণের প্রকৃত জবাবের বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন।তার শ্রেণীগত অবস্থান তার মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে যার বীজ সেই সময়ের রঙ্গালয়গুলির ইতিহাসের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ঠিক যে পরিমাণ ঔদ্ধত্য থাকা প্রয়োজন,তার প্রকাশ আমরা বেণিমাধবের মধ্যে লক্ষ্য করি।থিয়েটার সম্পর্কিত ভাবনা তার সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে রেখেছে।সে তার দলের প্রায় প্রত্যেককেই নিজের হাতে গড়ে তুলেছে।অনুরাধার চরিত্রে অভিনয় করা ময়নার পক্ষে অসম্ভব বলে সকলেই যখন তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে,তখন বেণি স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছে -

"শিখিয়ে নেব।বেণিমাধব চাটুয্যে বলছে,শিখিয়ে নেবে!বেণিমাধব চাটুয্যে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে,কাষ্ঠপুত্তলির চক্ষু উন্মীলন করে দিতে পারে,গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে পারে।...."

- নাটকে আমরা দেখতে পাই সত্যি সত্যিই বেণিমাধব পরম মমতায় দরিদ্র ময়নাকে একজন অভিনেত্রীতে রূপান্তরিত করেছেন।আবার নিজস্ব থিয়েটারের স্বপ্নে বিভোর হয়েই সেই ময়নাকেই বীরকৃষ্ণ দাঁ'র রক্ষিতায় পরিণত করতে তার বাঁধেনি।বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় গিরিশচন্দ্র-বিনোদিনী-গুর্মুখ রায়কে কেন্দ্র করে যে কাহিনী থিয়েটারের ইতিহাসে সুবিদিত,তারই ছায়াপাত নাট্যকাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়।

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার অভিনয়ের প্রতি সামাজিক বিরোধিতার যে বিচিত্র প্রকাশ আমরা নাটকে দেখতে পাই,তা সেই সময়ের বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন।শ্রেণীস্বার্থের পরস্পরবিরোধী সংঘাতের প্রবণতা বাঙালির রঙ্গালয়ের মধ্যে দিয়েও প্রতিফলিত হয়েছে।এই দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা নাটকের শেষ লগ্নে বেণিমাধব চরিত্রের বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছে।সামগ্রিকভাবে বাংলা থিয়েটার যে কখনোই শাসক,মুৎসুদ্দি বা সামন্তপ্রভুর স্বার্থ ও রুচির অনুকূলে পরিচালিত হয়নি সেই সত্য এই নাটকে উৎপল দত্ত ফুটিয়ে তুলেছেন।'সধবার একাদশী' নাটকে যে নিমচাঁদ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেণিমাধবের জনপ্রিয়তা,তাকে সরিয়ে রেখেই সে ওয়াহাবি বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে - অত্যাচারী,নারীধর্ষণকারী লেফ্টেনেন্ট মাগুয়ারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে।সেই নিপীড়ক মাগুয়ারের সাথে ইংরেজ অফিসার ল্যাম্বার্ট মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।নাটকটির প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত কালচেতনার বহুমাত্রিকতা আমাদের বিস্মিত করে।

নাটকের অন্যতম চরিত্র প্রিয়নাথ একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ।বাবু-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সে শ্রেণীচ্যুত অবস্থানে পৌঁছতে চায়।থিয়েটারের জন্য দৈহিক শ্রম কিংবা তার দারিদ্রকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে এই ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে।ময়নাকে ভালবেসে বীরকৃষ্ণের খপ্পর থেকে

তাকে মুক্ত করার ইচ্ছার মধ্যেও উপরোক্ত প্রয়াসটি নিহিত রয়েছে।যদিও শেষ পর্যন্ত সে ময়নাকে বাঁচাতে পারেনি।নিরুপায় প্রিয়নাথের হৃদয়ার্তির আবেগবিহ্বল বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যের শেষে -

"যতদিন আমার দেশ পরপদানত, ততক্ষণ কারুর নাই মুহূর্তেকের স্বস্তি বা বিশ্রাম।কলিকাতার রাজপথে বাংলার কৃষকের রক্ত ঝরিলে,তাহা আমারই রক্ত ঝরিল।সুদূর দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে নিহত কোন বিদ্রোহী সিপাহী,সে আমারই চূর্ণ বক্ষপঞ্জর।"

- প্রিয়নাথ তাই 'তিতুমীর' নাটক লিখেছে।লেখাপড়া না জানা গরীব মেথর,বেণীমাধব ও প্রিয়নাথ - তিনজনেই শ্রেণী অবস্থানের নিরিখে পরস্পরের সাথে গভীর ও সূক্ষ্ম সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে।

বসুন্ধরা,একজন রাজাবাহাদুরের প্রতারণায় বেশ্যা হয়েছিল।তারপর থিয়েটার তাকে আশ্রয় দিয়েছে,এর মধ্যেই সে পেয়েছে বাঁচার আশ্বাস।ময়নার মধ্যে দিয়ে,সে তার নিজের অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে।নিজের জীবনের থেকে বঞ্চনা ও গ্লানিকে সে ময়না ও প্রিয়নাথের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে মুছে ফেলতে চায়।কিন্তু তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।বেণিমাধবের ইচ্ছানুযায়ী এবং অভিনেত্রী জীবনের মোহময় তীব্র আকর্ষণে ময়না বীরকৃষ্ণর রক্ষিতা হয়ে থাকতে রাজী হয়েছে।রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সাফল্যই ময়নাকে বদলে দিয়েছে,থিয়েটার ছাড়া সে বাঁচবে না।সে বলেছে -

"দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি।সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উঠেছি এখানে, গায়ে উঠেছে গয়না,পায়ের কাছে হাতজোড় করে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে কলকেতার বড়লোকের দল।আবার ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে গেরস্ত ঘরে ঝি-গিরি আমি করতে পারবো না।"

- ময়না যাকে স্বাধীনতা বলে ভাবছে,তা যে আসলে একটা রুচিহীন,বিকারগ্রস্ত মুৎসুদ্দির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে থাকার অধীনতাকেই স্বীকার করে নেওয়া,সেটা প্রিয়নাথ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।কিন্তু চরিত্র বিচারের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাদের

সামাজিক অবস্থানকে স্মরণে রাখি,তবে কেন তারা শেষ পর্যন্ত থিয়েটারের প্রতি তীব্র আনুগত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি তা অনুভব করতে পারবো।

দি গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রসঙ্গের উল্লেখ নাটকে রয়েছে।নাটকের মাধ্যমে শাসকের বিরোধিতার কারণে গ্রেট ন্যাশনালের অভিনেতারা ল্যাম্বার্ট সাহেব কর্তৃক পীড়িত হয়েছেন।বাঙালীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের রক্তচক্ষু কিছুদিনের জন্য হলেও নাটকাভিনয়ের স্বাভাবিক প্রবাহটিকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।শাসকের ত্রাস ও মুৎসুদ্দির অসম্মতির কারণেই কাপ্তেনবাবু ও তার দল প্রিয়নাথের 'তিতুমীর' নাটক মঞ্চস্থ করতে পারেনি।তার বদলে তারা বাধ্য হয়েছিলেন 'সধবার একাদশী'র অভিনয়ে।অথচ রঙ্গালয়ে ল্যাম্বার্ট সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজ রাজপুরুষদের দেখে বেণিমাধবের ভিতরে অগ্নুৎপাত ঘটে - তিনি তিতুমীরের ভূমিকা নিয়ে সংলাপ বলতে থাকেন।সঙ্গে সঙ্গে,সহ-অভিনেতারাও তাদের ভূমিকা ও মঞ্চসজ্জা বদলে নিয়েছেন।বেণিমাধবের সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা স্বদেশপ্রেম তখন রঙ্গমঞ্চে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।দেশপ্রেমিক বীরের কণ্ঠে বেণিমাধব তখন উচ্চারণ করেছেন বিদ্রোহী তিতুমীরের অমোঘ সংলাপ -

"যতক্ষণ একটা ফিরিঙ্গি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে নে কখনো।"

- এভাবে অনিবার্য বিরুদ্ধতার মুখোমুখি যুগের সমস্ত মালিন্য,কুশ্রীতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে চরম মূহুর্তে বেণিমাধব কালোত্তীর্ণ কৃষ্টির নায়ক হয়ে ওঠেন।তবে শুধু বেণিমাধবই নন,নাটকের শেষে বসুন্ধরা,কামিনী,জলদ,ময়নাসহ সমস্ত নাট্যকর্মীই প্রতিবাদের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হয়েছেন।তাদের সমবেত সঙ্গীত প্রেক্ষাগৃহের সুপরিচিত পরিবেশে যে অভূতপূর্ব আবেগের সঞ্চার করে,তা যুগান্তরের নাট্যপ্রেমীদের রসপিপাসাকে চরিতার্থ করার সাথে সাথেই তার ইতিহাস চেতনার রূপান্তর ঘটায় -

"শুন গো ভারত ভূমি

কত নিদ্রা যাবে তুমি

উঠ ত্যজ ঘুমঘোর

হইল হইল ভোর

দিনকর প্রাচীতে উদয় "

১২.৪ অনুশীলনী

১. 'টিনের তলোয়ার' নাটকে ইতিহাসের অনুসরণের বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত কর।

২. উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকে ইতিহাসের নবমূল্যায়মন কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে নাট্যকাহিনীর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা বুঝিয়ে দাও।

৩. 'টিনের তলোয়ার' নাটকের চরিত্রগুলিকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে কতটা সাযুজ্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

৪. বেণিমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবু চরিত্রটি নির্মাণের ক্ষেত্রে নাট্যকার যে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন,তা ব্যাখ্যা কর।'টিনের তলোয়ার' নাটকে প্রিয়নাথের উপস্থিতি নাট্যকারের কোন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে?

১২.৫ গ্রন্থঋণ

১. টিনের তলোয়ার - উৎপল দত্ত

২. থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত - দর্শন চৌধুরী

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস - অজিতকুমার ঘোষ

৪. উৎপল দত্ত স্মরণ সংখ্যা - পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

৫. উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার - জগন্নাথ ঘোষ

৬. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস - দর্শন চৌধুরী

৭. বাংলা থিয়েটারের পূর্বাপর - নৃপেন্দ্র সাহা

৮. ইন্টারনেট

একক ১৩ – 'চাক ভাঙা মধু' – নাট্যকার মনোজ মিত্র

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ প্রস্তাবনা

১৩.২ নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্র

১৩.৩ 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের বিষয়বস্তু

১৩.৪ অনুশীলনী

১৩.৫ গ্রন্থঋণ

১৩.১ প্রস্তাবনা

মনোজ মিত্র আধুনিক বাংলা থিয়েটারের একজন সফলতম ব্যক্তিত্ব।সাফল্য কেবলমাত্র জনপ্রিয়তার নিরিখেই নয়,মৌলিক নাটক উদ্ভাবনের দ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণেও তিনি সফল।তাঁর সম্পর্কে ড.অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য -

"মনোজ মিত্র সাম্প্রতিক কালের একজন কৃতী নাট্যকার।তাঁহার দৃষ্টি নিত্য নব বিষয়সন্ধানী এবং তাঁহার মন বিচিত্র রসে মশগুল।সেজন্য একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি তাঁহার নাটকে নাই এবং কোন সংকীর্ণ তাত্ত্বিকতার সীমানার মধ্যে তিনি আবদ্ধ নহেন।মাঝে মাঝে তাঁহাকে একটু বিষণ্ণ কিংবা ক্রুদ্ধ মনে হয়,কিন্তু আবার অন্য সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রজাপতির মতো হালকা ডানা বিস্তার করিয়া রম্য বস্তুর সন্ধানে উড়িয়া চলে।তাঁহার ক্রুদ্ধ মেজাজ বাস্তবের প্রতিহিংসা ও বীভৎসতার মধ্যে কখনো কখনো এক জ্বালাময় রূপ ধারণ করে,কিন্তু মনে হয় ইহা ক্ষণিকের আত্মবিস্মৃতিমাত্র।তাঁহার

স্বাভাবিক মেজাজ প্রকাশ পায় প্রসন্ন জীবনের উপলব্ধিতে এবং স্নিগ্ধ কৌতুকরসের আস্বাদনায়।"

১৩.২ নাট্যকার হিসাবে মনোজ মিত্র

মনোজ মিত্র ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন।তাঁর গ্রামের নাম ধূলিহর।তিনি পিতা অশোককুমার মিত্র এবং মাতা রাধারাণী মিত্রের প্রথম সন্তান।মনোজ মিত্র বারো বছর বয়স পর্যন্ত অবিভক্ত এবং খণ্ডিত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন।১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মনোজ মিত্র ভারতে চলে আসেন।গ্রামের সহজতা,আন্তরিকতা,মায়াময় পরিবেশ,একান্নবর্তী পরিবার ত্যাগ করে ভারতে আসতে হয়েছিল বলে প্রথমাবধি কলকাতার প্রতি তাঁর একটা বিমুখতা গড়ে উঠেছিল।আসলে নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্নতা সকল অনুভূতিপ্রবণ শিল্পীর মনেই চিরস্থায়ী যন্ত্রণার জন্ম দেয়।এই প্রসঙ্গে আমরা ঋত্বিক ঘটকের মতো শিল্পীকে স্মরণ করতে পারি।দেশবিভাগ তাঁর মনে যে ক্ষত অঙ্কিত করে দিয়ে যায়,তার নিরাময় তিনি আজীবন খুঁজে পাননি।মনোজ মিত্রও তাঁর জীবনের আক্ষেপের কথা বারবার নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

মনোজ মিত্র প্রথম নাটক করার সুযোগ পান স্কুলজীবনে(নগেন্দ্রকুমার উচ্চশিক্ষা নিকেতন)।শিক্ষক সুধীর বসুর উৎসাহে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটকে অভিনয় করেন।এরপর কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাটক চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পান।এইসময় সহপাঠী হিসেবে পেয়েছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত,সুভদ্র সেন,প্রিয়ব্রত দেব,নৃপেন্দ্র সাহা প্রভৃতি মানুষদের।প্রথম জীবনে গল্পকার হওয়ার বাসনা পোষণ করলেও পরবর্তীকালে নাটক রচনাতেই মনোনিবেশ করেছেন।১৯৫৯ সালে থিয়েটার সেন্টার আয়োজিত একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 'সুন্দরম' দলের জন্য 'মৃত্যুর চোখে জল' রচনা করেন।সেটাই ছিল তাঁর প্রথম নাটক।নিজের ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ ঠাকুরদার মধ্যে যে জীবনতৃষ্ণা প্রত্যক্ষ করেছেন,তাকেই এই নাটকে রূপ দিয়েছেন।পড়াশোনা,কাজ এবং

থিয়েটার নিয়ে টানাপোড়েন সত্ত্বেও নাটক অভিনয়কে তিনি ত্যাগ করতে পারেননি।লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় ছেদ পড়েছে।তারপর আবার শুরু করেছেন নতুন উদ্যমে।১৯৬৩ সালে লিখেছেন পুরাণাশ্রিত নাটক 'অশ্বত্থামা'।পরের বছর সহ-অধ্যাপকদের সাথে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে 'অলীকবাবু' অভিনয় করেন।মতবিরোধের জন্য কখনে 'সুন্দরম' ছেড়ে গন্ধর্ব নাট্যগোষ্ঠীতে অভিনয় করেছেন,কখনো নিজে দল তৈরী করে ('ঋতায়ন')নাটক রচনা এবং পরিচালনা করেছেন।১৯৭০ সালে সভা ডেকে 'ঋতায়নে'র সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।এর সময়েই মনোজ মিত্র 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটি রচনা করেন।'সুন্দরমে'র পক্ষে এই নাটকটি পরযোজনা সম্ভব হয়নি।১৯৭২ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় নাটকটি অভিনীত হয়।ছন্নছাড়া 'সুন্দরমে'র জন্য ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'পরবাস' নাটকটি রচনার সময় থেকেই মনোজ মিত্র এই দলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

'সাজানো বাগান' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় (৭ই নভেম্বর, ১৯৭৭) থেকেই নাট্যকার-নির্দেশক মনোজ মিত্র এবং 'সুন্দরম'-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৮০ সালে এই নাটক অবলম্বনেই তপন সিংহ 'বাঞ্ছারামের বাগান' চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন।বাঞ্ছারামের ভূমিকায় অভিনয়ের পর থেকে মনোজ মিত্রের সঙ্গে এই চরিত্রটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।এরপরেই তিনি থিয়েটারের পাশাপাশি সিনেমাতেও সমানভাবে অভিনয় করে গিয়েছেন।এই বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন -

"আমার দিক থেকে বলার এইটুকু, কোনোটাকে ছাড়তে মন চায় না। দুটোকেই আমি ভালোবাসি।আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গেছে।"

- ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক রূপে যোগ দেওয়ার পর অভিনয় এবং নাটক রচনার সাথে পেশার বিরোধ মিটে যায়।১৯৯৪ সালে এই বিভাগেই 'শিশির কুমার ভাদুড়ী অধ্যাপক' পদে যোগ দেন।অবসর গ্রহণ করেন ২০০৩ সালে।

মনোজ মিত্র অন্ধকারের মধ্যেও জীবনের মূল্যবোধে আস্থাশীল ছিলেন।তাঁর নাটকের চরিত্রেরা সমাজের বিশিষ্ট মানুষ নন,বরং অসহায়,দুর্বল,প্রান্তিক অংশের প্রতিনিধি।আশ্রয়হীন মানুষের প্রতি দরদী মন নিয়ে তিনি তাকে শুভচেতনার পথে উত্তীর্ণ করেন।তিনি শ্রেণীসচেতন হলেও বক্তব্যকৈবল্যবাদী নন।তিনি বিশ্বাস করেন মানুষকে নিয়েই সাহিত্য,নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়।মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও মমতায় তিনি তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।তাঁর সম্পর্কে নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন -

"তাঁর রসবোধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও খুঁজে পায় মজার বা উপভোগের অফুরন্ত উপাদান।যে কোনও মানুষের মধ্যে,যে কোন ঘটনার মধ্যে,যে কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে এত যে রঙ্গের সম্ভাবনা ছিল,মনোজের সঙ্গে না থাকলে তা বোধহয় ধরাই পড়ত না।কিন্তু শুধু রঙ্গ নয়।....কাছ থেকে দেখলে ধরা পড়বেই,মানুষের জন্য গভীর মমতা ও ভালোবাসায় ভরে আছে মনোজের ভেতরটা।"

- মনোজ মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘের উত্তরাধিকারের থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখতে চেয়েছেন।আধুনিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের নিঃসঙ্গতাবোধের সংকট তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।একদিকে যৌথতা ও সমষ্টিগত জীবনের নানা টানাপোড়েন,অন্যদিকে মানুষের অন্তর্লোকের সমস্ত যন্ত্রণা ও জটিলতাকে ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়ে তাঁর নাটক আমাদের মনে আবেদন জাগায়।আসলে ব্যক্তি ও সমষ্টির সমন্বয়েই তো সমাজ পরিপূর্ণতা পায়,মনোজ মিত্র নিজেও সেই সত্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন।

'নীলকণ্ঠের বিষ'(১৯৬০) নাটকটি অভিনয়ের নিরিখে মঞ্চসফল নাটক।এই নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পাদরী লংম্যানকে অবলম্বন করে,যিনি একটি মেয়েকে ভালোবাসার অপরাধে পুরোনো গীর্জার নিঃসঙ্গ পরিবেশে নির্বাসিত হয়েছেন।সেখানে অবলম্বনহীন আর্ত,রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা-শুশ্রূষায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন।মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসা থাকলেও তাদের বাঁচাবার সঙ্গতি

বা সামর্থ্য তার নেই।নির্বাসিত পাদরীর জন্য যখন লোকালয়ের সম্মানিত দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে,কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে গিয়ে তিনি নিজেই কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েছেন।তাই প্রিয় মানুষের থেকে নিজেক বিচ্ছিন্ন করে,যীশুর প্রতি সমর্পিতপ্রাণ লংম্যান সেই নিঃসঙ্গ গীর্জাতেই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।মানুষকে যারা আজীবন ভালোবেসেছেন,তারাই মানুষের পরিত্যক্ত - এই সত্যই নাটকটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

মনোজ মিত্র কমেডি রচনায় কতটা পারদর্শী তার পরিচয় **'অবসন্ন প্রজাপতি'(১৯৬৩)** নাটকে ফুটে উঠেছে।নাটকের মূল চরিত্র মধুমিতা।সে সুচতুর অভিনেতা,ছলা-কলা এবং অসাধারণ বাকচাতুর্যে সে সকলকেই বশীভূত করে।তার নিন্দনীয় স্বভাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্বেও সকলেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে বিয়ের আর্জি জানিয়েছে।নাটকের শেষ দৃশ্যে বিগতযৌবনার ক্লান্ত স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে নাটকে কারুণ্যের স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে।

'সাজানো বাগান' নাটকের বাঞ্ছারাম চরিত্র নাট্যকারের একটি অমর সৃষ্টি।এই নাটকে দেখা যায় বৃদ্ধ বাঞ্ছারামের বাগানের প্রতি লোভবশত জোতদার নকড়ি দত্ত তার মৃত্যুর কামনা করেছে।মৃত্যুর পর বাঞ্ছার বাগানটি তারই হবে এই মর্মে,সে আগেই বাঞ্ছার সাথে চুক্তি করেছে।বিনিময়ে যতদিন না বাঞ্ছার মৃত্যু হয় ততদিন নকড়ি তাকে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে দু'শো টাকা করে দিতে সম্মত হয়েছে।জোতদার নকড়ির বিশ্বাস এক-দুই মাসের মধ্যেই বাঞ্ছা পটল তুলবে,তখন বাগান করায়ত্ত হবে তার।কিন্তু তিনমাস পেরিয়ে গেলেও বাঞ্ছা মরে না।নকড়ি ক্রমশই অধৈর্য্য হয়ে পড়ে।নাতি আর নাতবউকে পেয়ে বাঞ্ছার জীবনতৃষ্ণা জেগে ওঠে।তার আর মৃত্যুর মাঝখানে বারবার ব্যবধান হয়ে দাঁড়ায় জীবন।জীবন্মৃত্যুর দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত জীবনেরই জয় ঘোষিত হয়েছে,নবজাতকের কান্না শুনে বাঞ্ছা মরার বাসনা ত্যাগ করেছে,অন্যদিকে মৃত্যুর পরোয়ানাধারী নকড়ি হার্ট অ্যাটাকে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে।এই নাটক সম্পর্কে বিষ্ণু বসু বলেছেন -

"এই যে বাঞ্ছারাম যার বেঁচে থাকাটা অথবা বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা হয়ে উঠতে পারত ট্র্যাজেডি,নিদেন ট্র্যাজি-কমেডি,তা কিন্তু হল না।হল না নাট্যকারের নিজস্ব পক্ষপাতে।নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব থাকতে নেই এমন তত্ত্ব শোনা যায়, অন্তত শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে,কিন্তু সারা পৃথিবীতে কজন নাট্যকারই বা তা থাকতে পেরেছেন?অথবা আদৌ পারেন কি,তাঁদের পক্ষপাত কে লুকোতে?পারেন না বলেই বোধহয় আমরা পেয়ে যাই মনোজ মিত্রের বাঞ্ছারামকে।বাঞ্ছারামের মত মনোজ মিত্রও তাই জানিয়ে দেন দুনিয়ার বহু 'জিনিস মরণেও যেমন লাগে জনমেও তেমনি লাগে।'

'নরক গুলজার' নাটকে দেবচরিত্রদের মধ্যে মানুষের কথা ও আচরণ আরোপ করা হয়েছে।নরকবাসীরা হরণ করেছে যমরাজের স্ত্রীকে,নরকে হাজির হয়েছে জোতদার,নেতা,ব্যবসায়ী,মাস্তানের মতো চরিত্রেরা।নাটকটিতে কৌতুকরসের উচ্ছল প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়।রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং সংলাপের মধ্যে দিয়ে এখানে সমাজের যথাযথ প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

'রাজদর্শন' নাটকে লম্বোদরের চরিত্রটিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোভী,পেটুক,আত্মসর্বস্ব হিসেবে হাজির করা হয়েছে।স্বার্থে ঘা পড়লে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের সর্বনাশ করতে সে দ্বিধা করেনা।সাধের মালপো খাওয়ার জন্য জমিয়ে রাখা কলার কাঁদি তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আত্মসাৎ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে সে নিজেকেই নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দিয়েছে।এর মধ্যে একদিকে যেমন নিষ্ঠুরতা রয়েছে,তেমনি রয়েছে একজন গরীব ব্রাহ্মণের অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ।চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতায় তার ভারসাম্য বজায় রাখতে পারার দক্ষতা মনোজ মিত্রের নাটকে একটি আলাদা মাত্রা সংযোজন করে।সেই কারণেই লম্বোদরকে আমরা ঘৃণা করতে পারিনা,তার অস্তিত্বের নিষ্ফল উপায়হীনতা আমাদের সহানুভূতিকে আকর্ষণ করে।

গ্রাম্য থিয়েটারের নাটক,অভিনয়রীতি,উপস্থাপনা কৌশল ও দর্শকসমাজের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে **'কিনু কাহারের থেটার'**(১৯৮৮) নাটকে।দীর্ঘকাল আগে লিখিত 'কিনু কাহারের থিয়েটার' নিবন্ধটি রচনার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে ছিল এই নাটকের

বীজ।মনে রাখা দরকার আমাদের লোকনাট্যের ধারাটিকে চিরকাল সচল রেখেছে সমাজের নিম্নবর্ণের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষেরা।আলোচ্য নাটকটিতেও কিনু তাদেরই সমগোত্রীয়,জাতিতে কাহার।জাতব্যবসা ছেড়ে সে নিজেকে থিয়েটারের সাধনায় নিয়োজিত করেছে।ড.অজিতকুমার ঘোষ তার থিয়েটারকে যাত্রা বলার পক্ষপাতী,সেক্ষেত্রে কিনুর নিজের লেখা 'ঘন্টাকর্ণ' নাটক নয়,বরং পালা।এই পালার অভিনয়ে কিনুর সহযোগী পত্নী জগদম্বা,শ্যালিকা ও অন্যান্য অনুচরবর্গ।এর গাঁথুনি এলোমেলো,চরিত্র ও ক্রিয়ায় তেমন সঙ্গতি না থাকলেও পালাটি গরিষ্ঠ মানুষের মর্মযন্ত্রণার পাঁচালি হয়ে উঠেছে।কোন পাপ না করেও সকলের পাপ বহন করেছে ঘন্টাকর্ণ।বউ তার নাম দিয়েছে 'সাজাখেগো',কারণ সকলের সাজা সে পিঠ পেতে স্বীকার করে নিয়েছে।পালাটিতে নাট্যকার সমাজবাস্তবতার নানান স্তরকে স্পর্শ করেছেন।এখানে কৌতুকের অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচা ও ট্র্যাজিক মিশ্রণ।সবদিক থেকে বিচার করে সমালোচকেরা 'কিনু কাহারের থেটার'কে একটি প্রথম শ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন যার প্রতিটি কুশীলব অনায়াসেই বাস্তব এবং থিয়েটারের মধ্যে সঞ্চরণ করেন।

মনোজ মিত্র তাঁর বর্ণময় জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন।'শত্রু' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পর থেকে তিনি বাংলা সিনেমার খ্যাতিমান কমিক ভিলেনের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।সিনেমায় অভিনয় তাঁকে বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দিলেও তিনি সর্বদাই থিয়েটারের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেছেন। চিরন্তন মূল্যবোধে আস্থাবান,শিকড়সন্ধানী,গ্রামীণ সহজতার প্রতি অনুরক্ত মনোজ মিত্র আসলে অন্তর্মুখী,নম্রস্বভাব,কৌতুকপ্রিয় একজন মানুষ।নিজের নাটক রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন -

"My focus has always been on preservation and nourishment of values, human resources."

১৩.৩ ‘চাক ভাঙা মধু’ নাটকের বিষয়বস্তু

সমাজে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সর্বদাই দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। দ্বন্দ্বের অনুষঙ্গেই মানুষ অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে,জন্ম হয় প্রতিরোধ,বিদ্রোহ আর বিপ্লবের।এই পটভূমিতেই মনোজ মিত্র রচনা করেছেন তাঁর 'চাক ভাঙ্গা মধু' নাটকটি।শোষিত মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও নির্মম বেদনার এক মর্মন্তুদ চিত্র এই নাটকে ফুটে উঠেছে।মহাজন অঘোর ঘোষের নির্দয় বঞ্চনায় গ্রামের অভাবী মানুষ নিঃস্ব,দুর্দশা-কবলিত।শোষক মহাজন মাত্রাতিরিক্ত লোভ তাড়নায় এই অসহায় মানুষগুলোর সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।দুই বেলা ঠিক মতো অন্ন জোটে না তাদের মুখে।ক্ষুধার যন্ত্রণায় হাহাকার করতে থাকা মানুষ সমস্ত নিপীড়নের থেকে মুক্তি পেতে চায়।অথচ শ্রেণীসমাজের অসম বিন্যাসে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি মেলেনা।উপরন্তু ঘাড়ের ওপর চেপে বসে দাসত্বের গ্লানি।'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও আমরা দেখি সুদখোর মহাজন অঘোর ঘোষের কারণে বিপর্যস্ত মাতলার পরিবারে নেমে আসে অন্নাভাব।মাতলার মেয়ে বাদামি গর্ভাবস্থায় খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারে না।নিজের পেটের সন্তানের প্রতি তার অভিশাপ বর্ষিত হয় -

"এনেছো কিছু?যোগাড় করতি পারলে কিছু?....পারোনি?কিচ্ছু পাওনি, না? আজ তিন দিনের মধ্যি তুমি এট্টা দানাও জোটাতি পারলে না!...মরুক, কোন রাক্কোস এয়েছে প্যাটে - মরুক।"

- ভয়ংকর ক্ষুধায় মাতলার হাতে ধরা পড়েছে গোখরো সাপ।মুখ বাঁধা কলসীতে সেই সাপ নিয়ে আসে মাতলা, অভুক্ত কন্যার সাথে মর্মান্তিক রসিকতায় লিপ্ত হয় -

"এক্কে লাফে গাছে চড়ে দুই চাক পেড়ে ভেঙে দেখি...ঘন লাল টকটকে মধু.."

- মধুর বদলে বিষ, ঠিক এমনভাবেই যেন মাতলাদের জীবন সুদখোর মহাজনের শোষণে,জীবনের প্রতিকূলতায় বিষময়,তিক্ত হয়ে পড়েছে।তাই মাতলা ফণা তোলা

গোখরোকে পোষ মানাতে চেয়েছে,তাকে দিয়েই চরিতার্থ করতে চেয়েছে তার প্রতিশোধস্পৃহা -

"...মরার কালে উয়ারে আমি ছুঁড়ে মেরে যাবো পিথিবীর বুকি! যতো বজ্জাতে মিলে আমার য সব্বোনাশ করেছে -"

- তার কথা শেষ না হতেই জটা সাপে কাটা অঘোর ঘোষের সংবাদ নিয়ে এসেছে,যে মহাজন অঘোর ঘোষের অত্যাচারেই তাদের জীবনে নেমে এসেছে অপরিসীম দুঃখভোগ।তাই সঙ্গত কারণেই মাতলা অঘোরের বিষ ঝেড়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চায়নি।গ্রামের অত্যাচারিত সব মানুষেরাই অঘোর ঘোষের মৃত্যু কামনা করেছে।

একদিকে সাপে কাটা মানুষের শরীরকে বিষমুক্ত করার ওঝার সংস্কার,অন্যদিকে মনে জাগরুক অত্যাচারের স্মৃতি - দুইয়ের টানাপোড়েনে দ্বিধাগ্রস্ত মাতলা শেষপর্যন্ত অঘোর ঘোষের বিষ নামাতে বাধ্য হয়েছে কন্যার কারণেই।বাদামির শরীরে বেড়ে উঠেছে এক প্রাণকণিকা,সে বোঝে জীবনের মর্ম।নিজের সন্তানের জন্য সে নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ রচনা করতে চায়।উপরন্তু শঙ্কর তাকে লোভ দেখিয়েছে আশ্রয় ও সংসারের।

আসলে শোষিত শ্রেণির উপর নির্মম অত্যাচার-অবিচারে গড়ে ওঠা শোষক শ্রেণির আধিপত্যকে তারা কোনকিছুর বিনিময়েই ছেড়ে দিতে চায় না।ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য অবলম্বন করে নানান কৌশল।আলোচ্য নাটকেও অঘোর ঘোষকে সাপে কাটলে শঙ্কর পিতাকে বাঁচানোর জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেছে,পরিণত হয়েছে বাদামীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীতে।শুধু এখানেই শেষ নয়,নিজের পিতাকে বাঁচানোর জন্য সে নিম্ন শ্রেণির প্রতিনিধি মাতলার ঘরের মাটিতে পর্যন্ত বসে পড়ে,জল খেতে চায়।আবার তাদের পক্ষ নিয়ে দাক্ষায়ণীকে বলে -

"ভাবছি পিসি, এদের এতো ঋণ যে কি করে মেটাবো।"

- শঙ্কর বাদামিকে এই বিষয়েও প্রতিশ্রুতি দেয় যে তার বাবাকে বাঁচিয়ে তুললে মাতলার পরিবারের আর কোন অভাব থাকবে না,বাদামিকে স্বামীর ঘরে পাঠানোর

ব্যবস্থাও সে করবে।এভাবে ওঝা পরিবারের সারল্যের সুযোগ নিয়ে সে অঘোর ঘোষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।কত্তাকে ঝাড়াতে গিয়ে নিজের বিষটাও ঝেড়ে ফেলে মাতলা,উপলব্ধি করে প্রাণের মাধুর্য।অথচ জীবন ফিরে পেয়ে অঘোর ঘোষের মধ্যে সেই পুরাতন শোষণের রীতিই ফুটে ওঠে।শংকরের রূপও মুহূর্তে বদলে যায়।শরীর থেকে বিষ নামতেই অঘোর ঘোষ মাতলাকে বলে তার সুদ মেটাবার কথা বলে।বেহারা দিয়ে মাতলাকে মারার নির্দেশও দেয়।জান্তব লালসায় সে হাত বাড়ায় গর্ভবতী বাদামির দিকেও।এটাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তব,রূঢ় চিত্র।এভাবেই জমিদার, জোতদার,মহাজনদের অত্যাচারে গ্রামবাংলার নিরীহ কৃষিজীবী প্রান্তিক মানুষগুলোর জীবনে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সমাজে মহাজন-জোতদার বা উচ্চশ্রেণির লোভ-লালসার চিত্র তুলে ধরেছেন মনোজ মিত্র তাঁর নাটকে।শোষকের লোভ কখনও জমিজমাকে কেন্দ্র করে,কখনও অর্থের প্রতি,কখনও বা নারীর ভরা যৌবনকে ভোগ করার উদগ্র বাসনাকে কেন্দ্র করে।বাংলা সাহিত্যের অনেক সাহিত্যিকের রচনায় এর সমার্থক চিত্র আমরা দেখতে পাই।এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি,মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ'(১৮৭৩) নাটকটির কথা।সেখানে নারীমাংসলোলুপ জমিদার হায়ওয়ান আলীর দরিদ্র কৃষক আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহারকে অত্যাচারের পর হত্যা করেছে।'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও মহাজন অঘোর ঘোষের উদগ্র লালসার শিকার হয় বাদামি।ছেলের সামনেই অঘোর ঘোষ বাদামির প্রতি তৃষ্ণাতুর লালসায় উচ্চারণ করে -

'দে দে! তুই আমারে মধু দিবি।'

- শুধু বাদামি নয় অঘোর ঘোষ দাক্ষায়ণীর বৈধব্যের সুযোগ নিয়ে তার যৌবনকেও ভোগ করেছে।দাক্ষায়ণীকে সে পর্যবসিত করেছে স্রেফ যৌনদাসীতে।আজ বিগতযৌবনা সেই নারী অঘোর ঘোষের চোখে 'বুড়ী রাঁড়' ছাড়া কিছু নয়।শংকরের কাছেও সে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

নাটকের শেষাংশে আমরা উন্মত্ত বাদামিকে অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে হাতে সড়কি তুলে নিতে দেখি।তার পিছনে এসে দাঁড়ায় গ্রামের নিপীড়িত মানুষ।এই চিত্রের মধ্যে প্রতিরোধের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।তবে সোচ্চার বক্তব্যের ভারে এই নাটক মাটির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেনি।শত্রুর হত্যা এখানে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের রূপায়ণ হয়ে ওঠার বদলে বাদামির জেগে ওঠা নিরুপায় আক্রোশে মানবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ও সংগত প্রতিফলন হয়ে উঠেছে।

১৩.৪ অনুশীলনী

১. মনোজ মিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান কর।তাঁর নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত কর।

২. সংক্ষেপে মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকের বিষয়বস্তুর বর্ণনা দাও।

৩. মনোজ মিত্রের যে কোন পাঁচটি নাটকের আলোচনা করে নাট্যকার হিসেবে মনোজ মিত্রের সার্থকতা বিচার কর।

৪. 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণীশোষণের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

১৩.৫ গ্রন্থঋণ

১. চাকভাঙা মধু - মনোজ মিত্র

২. মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগত - বিষ্ণু বসু

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড.অজিতকুমার ঘোষ

৪. নাটককার মনোজ মিত্র - জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু

একক ১৪ – ‘চাক ভাঙা মধু’ – রাজনীতি, সামগ্রিক আলোচনা ও চরিত্র বিচার

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ নাটক 'চাক ভাঙা মধু' ও রাজনীতি

১৪.২ সামগ্রিক পর্যালোচনা ও চরিত্র বিচার

১৪.৩ অনুশীলনী

১৪.৪ গ্রন্থঋণ

১৪.১ নাটক ‘চাক ভাঙা মধু’ ও রাজনীতি

মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বটি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে।সমাজ-রাজনীতির সাথে সাহিত্যের যোগাযোগ গভীর।নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়।শৈশবের দিনগুলি থেকেই বাংলা নাটক তার সমসময়ের সমাজ এবং রাজনীতিকে বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।তবে বাংলা থিয়েটারের রাজনীতিকরণ ঘটেছে মূলত বিশ শতকে,গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার মধ্যে।খুব সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অবলম্বনে লিখিত যে নাটকে বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতবাদের প্রচার-প্রসারই মুখ্য উদ্দেশ্যই ,তাকেই রাজনৈতিক নাটক বলা যায়।এই ধরণের নাটকে সাধারণত একটি তত্ত্বকে আক্রমণ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি চিহ্নিত করা হতে পারে।সেক্ষেত্রে বিকল্প কোন মতাদর্শ বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার প্রবণতাও এখানে লক্ষ্য করা যায়।আমাদের আলোচ্য 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটি শ্রেণীসমাজের রূঢ় বাস্তবকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেও,রাজনীতির উচ্চকিত কণ্ঠঃস্বর এখানে শোনা যায়না।নাটকটির আদর্শ গণনাট্যের থেকে পৃথক ধরণের।

দীনবন্ধু মিত্রের অসামান্য রচনা 'নীলদর্পণ'-এর মধ্যে সার্থক রাজনৈতিক নাটক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রচিত এই নাটক বাঙালির মধ্যে প্রথম জাতীয় ভাবের স্ফূরণ ঘটায়।বাঙালির রঙ্গমঞ্চে নাটকটির অভিনয় তৎকালীন সময়ের শিক্ষিত বাঙালিকে অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলে।সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নীলদর্পণ'কে বিচার স্টো'র অমর সৃষ্টি 'Uncle Tom's Cabin'-এর সাথে তুলনা করেছেন।নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের ছবি না থাকলেও এই নাটকে ব্যক্তির পরিবর্তে কৃষকসমাজের সমস্যাই প্রতিফলিত হয়েছে।সচেতনভাবে না হলেও বাংলায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রাথমিক চিত্রটি এই নাটকেই প্রথম ধরা পড়ে।এর পরেও বাংলায় একাধিক জাতীয় ভাবের নাটক লেখা হয়েছে।সেক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার সূত্রে রাজনীতির প্রসঙ্গও এসে গিয়েছে বারবার।কিন্তু প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক নাটক আস্বাদনের জন্য আমাদের ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার(১৯৪৩) কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবেই গণনাট্য সঙ্ঘের আত্মপ্রকাশ।সমালোচকের মতে -

" 'গণ' শব্দটি প্রকাশ করল সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য,লাঞ্ছনা-বঞ্চনা এবং তাদের বাঁচার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী রূপকে।বাংলা নাটকে গণচেতনা এরূপ বিকাশ লাভ করেছে চল্লিশ দশকে।বাংলা নাটক সরে এল অপজাত,অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়,নিম্নগত ও মধ্যবিত্তের সংসারে।গণচেতনার পথেই এসেছে বাংলা নাটকের মুক্তি।...ধনবন্টনের বৈষম্য,সর্বব্যাপী শোষণ ও বঞ্চনা,সাম্যবাদের চৌম্বক আকর্ষণে নাটকের পাত্র-পাত্রী বদল হ'ল।শ্রমিক,মজুর,কৃষক ব্রাত্যদের আগমনে নবরূপে রূপ পেল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ।...মন্বন্তর,মহামারী আর বন্যায় ভেসে গেছে নাটকের পূর্ব পটভূমি,ঘটনা,বিষয়বস্তু,চরিত্র,আঙ্গিক,সংলাপ - সব রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক নিমেষে।"

- বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তরফলক বিশেষ।এরপর থেকেই সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী,কৃষিজীবী মানুষের

দুঃখ,দারিদ্র্য,বঞ্চনা তার কারণ নির্ণয়,শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ স্বরূপ উন্মোচনের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের সংকট থেকে উত্তরণ বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।গণনাট্য শুধুমাত্র 'শিল্পের জন্য শিল্প' মতবাদে বিশ্বাসী নয়,শিল্পকে সমাজ বদলের হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের বার্তাই তাঁরা ঘোষণা করলেন।সেক্ষেত্রে শিল্পী এড়িয়ে যেতে পারেন না তার সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি।

শিল্পের সঙ্গে রাজনীতির ঐক্যের কথা ঘোষণা করলেও রজনীতির অতি-প্রাধান্য গণনাট্যের শিল্পরূপকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছিল,নাটককে শ্লোগান সর্বস্ব করে তুলেছিল।গণনাট্য সঙ্ঘে ভাঙন এবং নবনাট্যের উদ্ভবের পেছনে এই কারণটি অনেকাংশে কাজ করে।ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বহুরূপী'।এরপর থেকেই আরম্ভ গ্রুপ থিয়েটারের কালারম্ভ।

মনোজ মিত্র যে সময়ে বাংলার নাট্যক্ষেত্রে পদার্পণ করছেন তার সাথে চল্লিশের দশকের নাটকগুলির স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।সমালোচকের মতে -

"চল্লিশের দশকের নাটকে সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার এবং মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ঘোষিত নীতি।কিন্তু ষাট দশকের নাট্যকারেরা সমাজবাস্তবের স্থূলতা পরিহার করে সূক্ষ্মতার দিকে ঝুঁকলেন।বক্তব্যকে করতে চাইলেন অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং নাটকের অবয়বে আনতে চাইলেন অধিকতর শিল্পসুষমা।গাতনুগতিকতাকে বর্জন করে নতুন কথা নতুনভাবে বলার জন্য এক নব পর্যায়ের নাট্য আন্দোলন শুরু করলেন।"

- নবনাট্য আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যই ছিল গণনাট্যের আদর্শকে স্বীকার করে নিয়েও নাটকের শিল্পমূল্যকে বজায় রাখা।'নবান্ন' বাংলা নাটকের বিষয়বস্তু এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৈপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।তারই ধারাবাহিকতায় নাটকে এল সর্বশ্রেণীর,সর্বস্তরের মানুষ।তাদের শ্রেণীপরিচয়কে স্বীকার করে নিয়েও নাট্য রচয়িতাগণ তাদের ব্যক্তিস্বরূপের প্রতি আগ্রহী হলেন।মনোজ মিত্র এই নবনাট্যের

কালেই প্রথম নাটক রচনা করেছেন।ব্যক্তিগত জীবনে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বোধ ও আদর্শে বিশ্বাস থাকলেও তাঁর নাটক প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক নয়।তাঁর নিজের মন্তব্য -

"আমি যখন নাটক করতে আসি তখন আমার সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ ছিল না।ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম না।...তবে হ্যাঁ, এই কথা তো ঠিক আজকে আমার একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস আছে।আমার নাটকেও তা প্রতিফলিত হয়।...আমি নিজে রাজনীতির সঙ্গে যতটা যুক্ত,আমার নাটকও রাজনীতির সঙ্গে ঠিক ততটাই যুক্ত।আমি রাজনীতি থেকে যতখানি দূরে,আমার নাটকও ঠিক ততখানি দূরে।তবে এটাতো ঠিকই, একজন মানুষ যখন নাটক লিখবেন বা করবেন,তখন তার সামাজিক,রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নাটকে প্রতিফলিত হবেই।সেটা সোচ্চারেই হোক কিংবা গোপনেই হোক।"

- রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক,মনোজ মিত্র কখনোই দলীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না।নাটকে তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চান।কোন বক্তব্যকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চান না।'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও সেই প্রবণতা স্পষ্ট।নাটকের শেষে অঘোর ঘোষের বিরুদ্ধে বাদামির হাতে সড়কি তুলে নেওয়া এবং তার পেছনে গ্রামের সাধারণ মানুষের সমবেত অবস্থান বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটককে স্মরণ করালেও,সেই নাটকের মতো শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ এখানে নেই।শ্রেণীপরিচয়ের পাশাপাশি এখানে মাতলা,জটা,বাদামির ব্যক্তিপরিচয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।গ্রামের অন্যান্য মানুষের মতোই মাতলাও সর্পদংশনে বিপন্ন অঘোর ঘোষের প্রাণনাশের কামনাই করেছে।আবার পারিবারিক পেশার কারণেই তার মনে প্রাচীন সংস্কার,সাপে কাটা রোগী বাড়িতে এলে তাকে ফিরিয়ে দিতে নেই।মাতলা বা বাদামির চরিত্র অরণ্যাচারী মানুষের জান্তবতা এবং অকৃত্রিম সারল্য নিয়েই গড়ে উঠেছে।আসলে মনোজ মিত্র ঠিক যেমনভাবে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন,পাঠক-দর্শককেও ঠিক তেমনভাবেই দেখাতে চান।এই দেখার দৃষ্টি কোন তাত্ত্বিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ নয়।নাট্যঘটনাকে তিনি যতটা সম্ভব

বিশ্বাসযোগ্যভাবেই পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।তাই বাদামি,মাতলা,জটার মতো চরিত্রগুলি আমাদের কাছে অবাস্তব বলে মনে হয় না।'চাক ভাঙা মধু' নাটকেও এই বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন যার মধ্যে দিয়ে শ্রেণী সমাজের দ্বন্দ্বময়তার ক্ষেত্রটি যতটা আমাদের চোখে পড়ে,ঠিক ততটাই সমাজের অসঙ্গতি এবং শোষণের চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৪.২ নাটক ‘চাক ভাঙা মধু’র সামগ্রিক পর্যালোচনা ও চরিত্রবিচার

'চাক ভাঙা মধু' নাটকের পটভূমি এবং চরিত্রায়ণ সম্পর্কে মনোজ মিত্র স্বয়ং মন্তব্য করেছেন -

"জলজঙ্গলের দেশে জন্ম আমার।চাক ভাঙা মধুর মাতলা,বাদামিকে দেখেছি আমি খুব কাছ থেকে,দেখেছি তাদের লজ্জা নিবারণের ছেঁড়া তেনি,রুক্ষ উড়োখুড়ো খসখসে চামড়ার মানুষগুলো ভাঙা সানকিতে শাকপাতা খাচ্ছে।দারিদ্র্য তাদের সহোদর।"

- নাটকে মাতলার যে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, উপরোক্ত বর্ণনার সাথে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে -

"টান-টান পাকানো এক গোছা শাদা দাড়ির মতে তার চেহারা - খড়ি ওঠা বুক, পিঠ,অর্ধনগ্ন চুপসানো পেট,রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল,ভাঙাচোরা মুখ।"

- এইভাবে 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে নাট্যকার তাঁর চোখে দেখা বাস্তবতাকেই আমাদের সামনে হাজির করেছেন।মাতলা সমাজের একজন প্রান্তিক মানুষ।পারিবারিকভাবে সে ওঝার বৃত্তিধারী,সর্পদষ্ট মানুষকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনাতেই তার সিদ্ধি।সেই কাজই তার মুখে অন্ন জোগায়।নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই সে এবং তার কন্যা দুজনেই অন্ন সংকটে কাতর।বৃদ্ধ কাকা জটা-ও বেঁচে থাকার জন্য তার ওপরেই নির্ভরশীল।অথচ তিনজনের সংসারে অভাব ও অসঙ্গতির ছাপটি স্পষ্ট।এই অসঙ্গতি শ্রেণীশোষণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।দিনের পর দিন ধরে সুদখোর মহাজন অঘোর ঘোষের

অত্যাচারে শুধু সেই নয়,তার গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষই বিপর্যস্ত হয়েছে।মহাজন অন্যায়ভাবে তাদের জমি দখল করেছে,বিষয়-আশয় গ্রাস করেছে,এমনকি গ্রামের নারীদেরও গায়ের জোরে অধিকার করতে চেয়েছে।এই চিত্র যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তা আমরা পূর্বেই জেনেছি।সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ঘটনা বাস্তব।এই নাটকেও অঘোর ঘোষ শোষক মহাজন-জোতদারদের প্রতিনিধি।বিপরীতে মাতলার মতো মানুষেরা প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা।সুস্থভাবে জীবনধারণের জন্য সঙ্গতিবিহীন এই মানুষগুলিকে মহাজনের ওপরে নির্ভর করতেই হয়।বছরের পর বছর ধরে তারা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষের প্রতাপ এবং অসম্মান মুখ বুজে সহ্য করে চলে।আলোচ্য নাটকে অবশ্য প্রবল প্রতাপান্বিত,অত্যাচারী অঘোর ঘোষকে জীবনমরণের প্রশ্নে মাতলার ওপরেই নির্ভরশীল করে নাট্যকার কাহিনীতে এক বৈপরীত্য বুনে দিয়েছেন।সর্পদষ্ট অঘোর ঘোষের ডুলি এসেছে মাতলার উঠোনে।কিন্তু পূর্বের অত্যাচার স্মরণ করে অঘোর ঘোষের প্রাণ উদ্ধারে মাতলা সম্মত হতে পারেনি।বরং জটার মন্ত্রণায় সে যেনতেনপ্রকারেণ সময় নষ্ট করে অঘোরের প্রাণকে বিপন্ন করতে চেয়েছে।বিষজর্জর অঘোরের ডুলির সামনে নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করতে গিয়ে তারা দ্বিধাবোধ করেনি।অথচ নাটকের শেষে যখন অঘোরের প্রাণসংশয় কেটে গিয়েছে,তখন দেখা গেছে সাপের কামড় সত্ত্বেও সে পুরোপুরি নিশ্চেতন হয়ে পড়েনি,বরং মাতলা ও গ্রামবাসীদের সমস্ত গতিবিধি সম্পর্কেই অবগত হয়েছে।এই ঘটনার দ্বারা শোষকের শ্বাপদ চরিত্রটিকে ইঙ্গিতময়ভাবে প্রকাশিত করেছেন নাট্যকার।অঘোরের ডুলির সঙ্গে এসেছে তার পুত্র শংকর।তার চরিত্রে অধুনা পুঁজিবাদের সমস্ত লক্ষণগুলিই প্রকাশিত।নিরন্তর ঘটে চলা সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে নাট্যকার যে সম্পূর্ণ সচেতন তা শংকরের চরিত্রে উপস্থাপনার মধ্যেই স্পষ্ট।সে অনেক বেশী ধূর্ত,শ্রেণীশোষণের আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে ফুটে উঠেছে।গ্রামের মানুষদের ওপর অঘোর ঘোষের নির্মম অত্যাচারের সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অবহিত।সেই নির্মমতার কারণেই মাতলা তার পিতার বিষ নামাবার ব্যাপারে উদাসীন।মাতলা ও অন্যান্য গ্রামবাসীদের মনোভাব শংকরের অজানা নয়।সে নিজেও শোষক শ্রেণীরই

প্রতিভূ।কিন্তু সে জানে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জোতদারি শোষণের বীভৎসতা প্রজাসাধারণের মনে বিরুদ্ধতার জন্ম দিতে পারে।এই ব্যাপারে সে অনেক বেশী সূক্ষ্ম উপায়ানুসারী।দাক্ষায়ণীকে সে স্পষ্টই বলেছে -

"দু'হাতে সামনে যাকে পেয়েছো তার সর্বস্ব মুড়িয়ে খেয়েছো!বুয়েছো,একটু রয়েবসে খেতে হয়!ওজন বুঝে চলতে হয়!যে ডালে বসে পা দোলাবে সে ডালে কোপ মারতে নেই।পরিণামে মহাকবি বাল্মিকীর দশা হয়..."

- তাই পিতাকে বাঁচাবার জন্য সে সরল ওঝা পরিবারের প্রতি ছলনার আশ্রয় নিয়েছে।প্রথমে দেখিয়েছে অর্থের লোভ - বাদামির কাছে সর্পমন্ত্রের 'রেট' জানতে চাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে মনোভাব স্পষ্ট।মাতলার পরিবর্তে সে বাদামির দিকে মনোযোগ দিয়েছে।কারণ নারী হওয়ার দরুণ বাদামির মধ্যে মমতার সহজাত উপস্থিতি সম্পর্কে সে নিঃসন্দিহান।বাদামির শরীরে আসন্ন প্রাণের লক্ষণ।তাকে প্রভাবিত করার জন্যই শংকর নিজের শ্রেণী অবস্থান থেকে সরে এসেছে।নিজেকে প্রতিপন্ন করেছে তার আপনার জন হিসেবে।যতক্ষণ না কার্যোদ্ধার হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ছদ্মবেশ এবং অভিনয়াত্মক সংলাপের কোন পরিবর্তন হয়নি।কিন্তু অঘোরের শরীর থেকে বিষ নেমে যেতেই তার আসল চরিত্রটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।সেও তার বাবার মতোই শোষক,কিন্তু অনেক বেশী ক্ষিপ্র,শাণিত বুদ্ধির অধিকারী।সহজ,সরল বাদামিকে বশ করা তার পক্ষে কোন ব্যাপারই না।

আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাদামি।তার চরিত্রটি নাট্যঘটনায় গতি সঞ্চার করেছে।সে স্বামী-পরিত্যক্তা অসহায় নারী।তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সনাতন বাঙালি মায়ের রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।সে প্রাণস্বরূপিনী।তার পিতা ও বৃদ্ধ দাদা অঘোর ঘোষের প্রাণনাশ কামনা করলেও,সে ততটা নির্মম হতে পারেনা।আসলে আসন্নপ্রসবা বাদামি জানে প্রাণের মূল্য।তাই অত্যাচারী মহাজন বিপন্ন অবস্থায় তার দরজায় এসে দাঁড়ালেও সে পূর্বের সমস্ত অবিচার সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছে।বাদামি চরিত্রের কোমলতার এই দিকটি সম্পর্কে অবহিত বলেই ধূর্ত শংকর বা দাক্ষায়ণী তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে

চায়।আসন্ন সন্তানের নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাদামির স্নায়ুমণ্ডলীকে দুর্বল করে দেয়।উপরন্তু শংকর তার মনে স্বামীর প্রতি সুপ্ত অভিমানকে জাগিয়ে তুলে তাকে দুর্বল করে দেয় -

"হরিশ লোকটা অভাবে পড়ে তোকে ছেড়েছে।ওই অঘোর ঘোষকে দিয়ে আমি তোদের সব অভাব মিটিয়ে দেব।আমি আড়তদার মানুষ...স্পষ্টা-স্পষ্টি কথা। অঘোর ঘোষকে বাঁচিয়ে দে, আমি দেখব...হরিশ,তুই আর তোদের বাচ্চাটা যেন বাঁচে! ভালোভাবে বাঁচে!"

- সংকটের আশ্বাস বাদামির মনে সংসারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।সে তার সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়,চায় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে।নাটকের বিভিন্ন সংলাপে তার আবেগ ও বিতৃষ্ণার পরিচয় আমরা পেয়েছি।দিনের পর দিন অন্নাভাবে তার প্রাণ যেতে বসেছে।মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্তানাকাঙ্ক্ষী বাদামী একা সমস্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে যেতে চেয়েছে।মাতলার প্রতি অনুনয় করে সে বলেছে -

"দ্যাও,দ্যাও,বাঁচায়ে দ্যাও...কী হবে ট্যাকায়,কী হবে পয়সায়...ও বাপ,তুমি না ওঝা!তোমার হাতের গুণ কী যে বাপ,দু'বার টান মেরে ফুঁক পাড়লি,তরতর করে পালায় বিষ...পালাবার পথ পায়না!.."

- বাদামির কারণেই মাতলা বাধ্য হয়েছে অঘোরকে বাঁচিয়ে তুলতে।তার বিষ ঝাড়তে গিয়ে মাতলা এক নতুন বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে,ঝেড়ে ফেলেছে নিজের মনের বিষ।অনাগত শিশুর দিকে তাকিয়েই হয়তো সেও উপলব্ধি করেছে প্রাণের মাহাত্ম্য।সারল্যের কারণেই সে বিশ্বাস করতে চেয়েছে মানুষের শুভবোধের ওপর।বিষ নেমে গেলে যে অঘোর ঘোষ অন্য মানুষে পরিবর্তিত হবে,সেই আশ্বাস সম্পর্কে সে অনেকটাই নিশ্চিন্ত ছিল।কিন্তু নাটকের একদম শুরুতে সে তার অভুক্ত কন্যার সাথে চাক ভাঙা মধুর বিষয়ে যে রসিকতা করেছিল,ঠিক সেভাবেই তার আস্থা শোষকের খলতা ও ছলচাতুরির মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে।সেরে উঠেই অঘোর তার স্বমহিমায় ফিরে এসেছে।শংকরের মূর্তিও বদলে গিয়েছে মুহূর্তেই।এরপর অঘোর ঘোষের দৃষ্টি গিয়েছে গর্ভবতী বাদামির প্রতি।অসুস্থতার মধ্যেও অঘোর ঘোষের মনে

নারীমাংসলোভ জেগে উঠেছে,বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সে বাদামিকে নিয়ে যাবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।ভুল ভেঙে গেলে মাতলা তার পায়ে এসে পড়েছে।কিন্তু নিকৃষ্ট অঘোর ঘোষের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।এখানেই বাদামির চরিত্রটির রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার।সন্তানের প্রাণের কথা ভেবে,তার ভবিষ্যত নিশ্চয়তার কথা ভেবেই সে অঘোর ঘোষকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধারের কথা ভেবেছে।আবার সেই মাতৃত্বই তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে তুলেছে।মাতলার মতোই সে অঘোর ঘোষের দিকেও মুখ বাধা কলসী এগিয়ে দিয়েছে।অথচ তার ভিতরের বিষধরটি ততক্ষণে মৃত।গর্ভবতী কন্যার কথা ভেবে মাতলা পূর্বেই তাকে হত্যা করেছে।হতভম্ব অঘোরের হাত থেকে কলসী কেড়ে নিয়ে তাকে উঠোনে ভেঙে ফেললেই বাদামি প্রকান্ড ভন্ডামীর মতো ফুলে ফেঁপে ওঠা গোখরোর হাঁ-করা মাথাটা দেখতে পায়।তীব্র আক্রোশে সে হাতে তুলে নেয় কচ্ছপ ধরার সড়কি,পালাতে চাওয়া অঘোর ঘোষের ওপর নামিয়ে আনে শেষ আঘাত।বিশিষ্ট নাট্যকার উৎপল দত্ত মন্তব্য করেছেন -

" 'চাক ভাঙা মধু'তে গোড়া থেকে এমন এক ভীষণ জগত সৃষ্টি করা হয়েছে যে শেষে সড়কি দিয়ে কেন,অঘোরকে যদি খাঁড়া দিয়ে রণরঙ্গিনী বাদামি টুকরো টুকরো করে মঞ্চে ছড়িয়ে দিতো সেটা হতো অতি সহজ পরিণতি।শোষকের বিরুদ্ধে ঘৃণা এই ভাবেই সৃষ্টি করতে হয় নাটকের মাধ্যমে।...প্রাণের মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বাদামি সড়কি চালায়।"

- এইভাবেই আলোচ্য নাটকে প্রাণের মূল্যের নিরিখেই আলোচিত হয়েছে সাধারণ মানুষের ওপর শোষক-শাসকের নিদারুণ অত্যাচার।নকশালবাড়ি আন্দোলনের সমসময়ে রচিত এই নাটকে অত্যাচারী মহাজনের সামগ্রিক পরাজয়ের চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন মতাদর্শের কথা এই নাটক বলেনা,কেবলমাত্র জয় ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে অন্তর্লীন চিরকালীন শুভবোধের।

১৪.৩ অনুশীলনী

১. মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটি ঠিক কতটা পরিমাণে রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে ব্যাখ্যা কর।

২. মনোজ মিত্রের 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে শংকর চরিত্রের উপস্থাপনার ব্যাপারে তোমার মতামত লেখ।মাতলার চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে নাট্যকার কতটা বাস্তবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন বর্ণনা কর।

৩. 'চাক ভাঙা মধু' নাটকে কাকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দেওয়া যায়? নাটকে চরিত্রটির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোকপাত কর।

৪. 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটিকে কী গণনাট্যের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৪.৪ গ্রন্থঋণ

১. চাকভাঙা মধু - মনোজ মিত্র

২. মনোজ মিত্রের বিশ্বাসের জগত - বিষ্ণু বসু

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস - ড.অজিতকুমার ঘোষ

৪. নাটককার মনোজ মিত্র - জনপ্রিয়তার দুই দশক - সৌমিত্র বসু